আনন্দমেলা
১৭ জুন ১৯৮১
১.৫০
লিলিপুটের নতুন দেশ

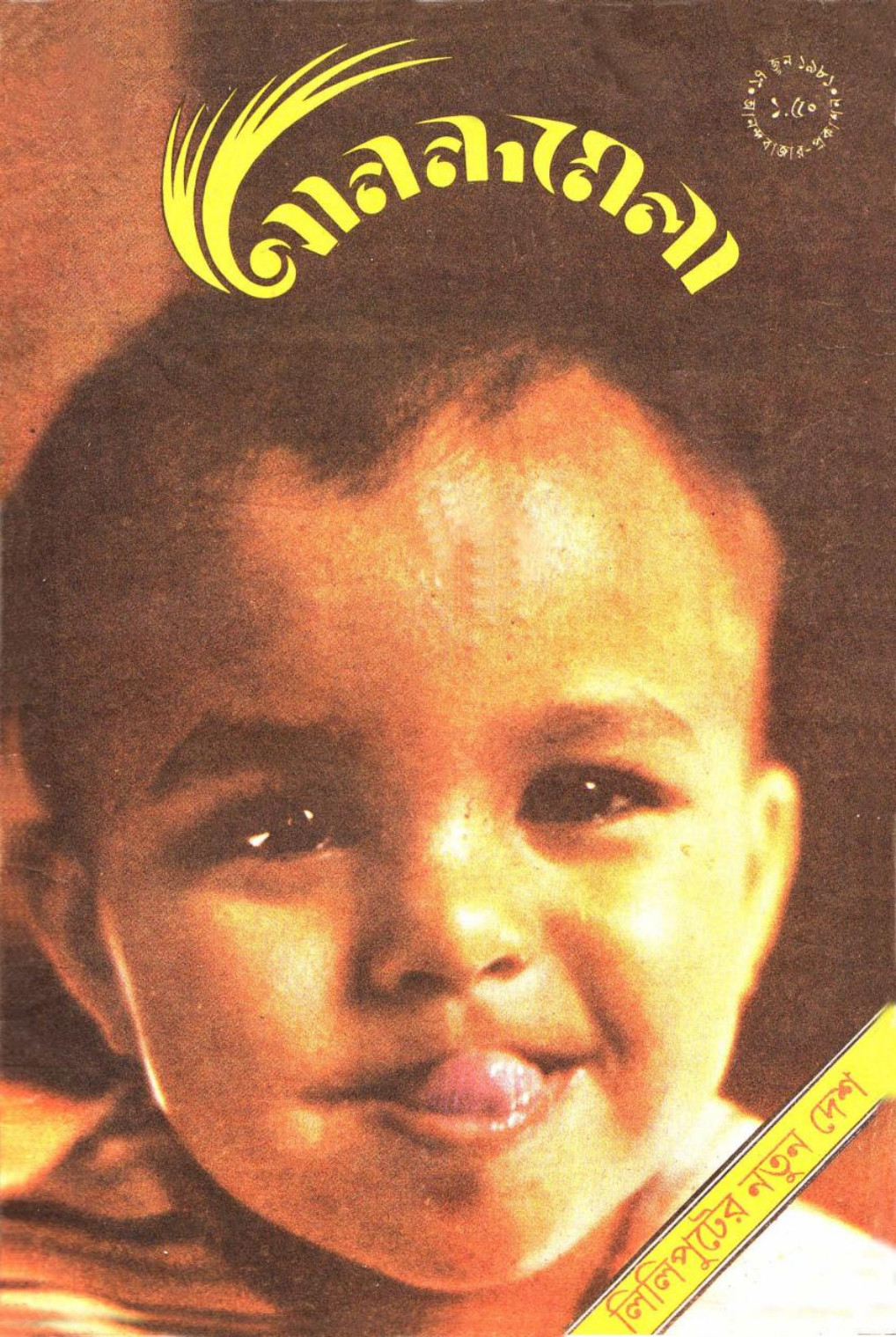

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

আনন্দমেলা

২ আষাঢ় ১৩৮৮ • ১৭ জুন ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ৫ সংখ্যা

গল্প

হেতো ভূতের কথা। বলরাম বসাক ১০

অভিশপ্ত ঝিল। শান্তনু ভট্টাচার্য ২১

আন্তর্জাতিক পশুবর্ষ। নবকুমার বসু ২৪

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৮

উপন্যাস

সিসের আঙটি। বিমল কর ১৪

হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫১

ছড়া

বানানের ছড়া। দেব সেনাপতি ২৭

ভ্রমণকাহিনী

লিলিপুটের নতুন দেশ। মহাশ্বেতা চৌধুরী ৪

ইতিহাসে উপেক্ষিত। আশিস দাশ ৩৬

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি. কে. ৫৬

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২

টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

খেলাধুলো

হকির দিকে চোখ নেই। অলোক দাশগুপ্ত ৪২

পেলের পছন্দ। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৪

ফেডারেশনে মোহনবাগান ৪৭

নতুন চ্যাম্পিয়ান অনিল। কুশল রায় ৪৯

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২

সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৩৮

তোমাদের পাতা ৩৯, মণিমেলার খবর ৫৫

প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের জন্য ৫৫

মার্ভিন ফার্নাণ্ডেজের পুরোপাতা রঙিন ফোটো

প্রচ্ছদ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্‌স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেট্টা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

গত বছরে
কী দিয়ে
সব ধরনের কাপড়
ঘরেতেই ধুয়ে আমি
১০০/- টাকা বাঁচিয়ে
ফেলেছি !

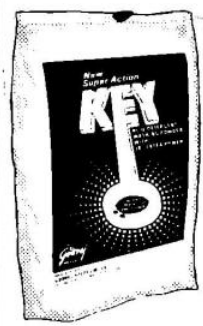

দারুণ কার্যকরী কী গরম, ঠাণ্ডা — দু'রকম জলেতেই চটপট গুলে গিয়ে রাশি রাশি ফেনা তৈরী করে, যা কাপড়ের সব ময়লা নিংড়ে ধুয়ে কাপড় চমৎকার পরিষ্কার করে ফেলে।

দারুণ সাদা করার ক্ষমতাসম্পন্ন কী আপনার কাপড়কে করে তোলে ধবধবে সাদা, ঝলমলে উজ্জ্বল। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে কাপড় দারুণ সাদা ও উজ্জ্বল করার বিশেষ এক কার্যকরী উপাদান।

দারুণ সাশ্রয়কর কী পাওয়া যায় ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কিলো ও ২ কিলোগ্রামের প্যাকে।

দারুণ-কার্যকরী।
দারুণ-সাদা করার শক্তি।
দারুণ-সাশ্রয়কর।

কী
ব্লু ডিটারজেণ্ট পাউডার

গোদরেজ-এর উৎপাদন

CHAITRA-G-137 BEN

লিলিপুটের নতুন দেশ

মহাশ্বেতা চৌধুরী

সবকিছু ছোট, ঘরবাড়ি আরও ছোট

হঠাৎ যদি এমন দেশে পৌঁছে যাই যেখানে ঘরবাড়ি, গাছপালা, যানবাহন সব খুদে মাপের তাহলে নিজেকে দৈত্যের মতো বড় লাগবে নিশ্চয়ই। না, কোনো রূপকথার রাজ্যে নয়, আমাদের এই পৃথিবীতেই এমন অণুদেশ আছে হল্যাণ্ডের রাজধানী দ্যেন হাখ (ইংরেজিতে যাকে বলে দ্য হেগ) থেকে কয়েক মাইল দূরে। নাম মাডুরাডাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অকালমৃত এক তরুণের স্মৃতিরক্ষার্থে তার বাবা-মা এটির গোড়া-পত্তন করেন। পরে ডাচ সরকার অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে এই মিনিরাজ্যটির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। মাডুরাডাম আসলে একটি অভিনব প্রমোদ উদ্যান। মূলত ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য হলেও পর্যটকদের কাছে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়। এর পরিধি দুই বর্গ মাইল, গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি সাধারণ দর্শকের জন্য খোলা থাকে। ছোটদের জন্য মনে হলেও বড়দের ভিড়ও কম হয় না। ঢোকার টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয় অনেকক্ষণ, সে-ভিড়ে ডাচ এবং বিদেশী পর্যটক দুইই আছে।

মাডুরাডামকে একটি নিখুঁত অণু ডাচ শহর বলা যেতে পারে। হল্যাণ্ডের যে-কোনো শহরের ধাঁচে সাজানো—একদিকে পুরনো ডাচ শহর, অন্যদিকে আধুনিক। পুরনো অংশে বাড়িঘর প্রাচীন স্থাপত্যের রীতিতে তৈরি। কাঠের ছোট ছোট বাড়ি, কালো চিমনি ছাত থেকে উঠে গেছে। জানলায় কাঠের বাক্সে ফুলের সমারোহ। ঝাগান, রাস্তাঘাট গাড়ি-ঘোড়া সেকেলে ধরনের। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত কাঠের উইণ্ডমিল (যাতে হাওয়ার সাহায্যে কল চালিয়ে গম ভাঙা হত), পুরনো কালের জলতোলার কাঠের কপিকল পর্যন্ত নির্ভুলভাবে রয়েছে। তফাত শুধু মাপের।

আধুনিক শহরটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর জায়গা জুড়ে। বাড়িঘর আজকের যে-কোনো ডাচ শহরের মতো অত্যাধুনিক রীতিতে তৈরি। উচ্চতল বাড়িও রয়েছে ছোট ছোট বাড়ির সঙ্গে। দোকান, বাজার, পার্ক, সুপারমার্কেট—কোনোকিছুরই অভাব নেই। ইউরোপে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বহু শহর

ছোট বাড়ির চারদিকে ছোট ছেলেমেয়েরা

নতুন ধাঁচে আবার গড়া হয়েছে আর তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে এক-একটি প্রাচীন গির্জা অবিকৃত রয়ে গেছে। মাডুরাডামেও সে-রকম পুরনো গির্জা নতুন স্থাপত্যের মাঝখানে অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য সুন্দর হল সবকিছুর সঙ্গে মানানসই খুদে মাপের গাছগুলি। ছোট ছোট হলে কী হবে, সাবালক গাছগুলির ডালপালায়, ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ রূপ। জাপানি পদ্ধতিতে এই বামন গাছগুলির সযত্ন পরিচর্যা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ধৈর্যের ব্যাপার। ডাচদের পুষ্পপ্রীতি বিশ্ববিখ্যাত। এদের পথেঘাটে হাটেবাজারে সর্বত্র ফুলের মেলা। এই মিনিশহরেও তার ঘাটতি নেই। পুতুল-বাড়িগুলি স্থাপত্যেই শুধু নিখুঁত নয়, ভেতরের আসবাবপত্র, শোবার ও বসবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার, শিশুদের ঘর—সব ঘরেই প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে। বারান্দায়, ঘরে লোকজনও আছে বসে বা দাঁড়িয়ে।

বাড়িঘরের মতো রাস্তাঘাটও অপূর্ব এই পুতুলের দেশে। পাশ্চাত্ত্য যে-কোনো দেশের মতো ঝকঝকে চওড়া মসৃণ রাস্তা, শহরের ভেতরে ও বাইরে দ্রুতগামী যানের জন্য একমুখী মোটরওয়ে উড়ালপুল সমেত সম্পূর্ণ। ট্র্যাফিক আলো, রাস্তার আলো, এমন-কী রাস্তার পাশে দূরে দূরে পেট্রলপাম্পও রয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার গাড়িগুলি সব চলছে, তলায় রেল পাতা আছে। দূর-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে চলছে মনে হল। আধুনিক শহরটি একেবারে জ্যামিতিক নকশায় তৈরি আজকের যে-কোনো ইউরোপীয় শহরের মতো। সমান্তরাল রাস্তা, কোথাও পার্ক, ফোয়ারা—সব মিলিয়ে একটি পূর্ণ ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হল্যাণ্ডের বহু অংশই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। ফলে অনেক শহরই **অতি আধুনিক** ধাঁচে প্রায় নতুন করে তৈরি। রটারডাম নামে হল্যাণ্ডের বন্দরটি ইউরোপের প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণে বন্দরটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। **যুদ্ধোত্তর** কালে নতুন করেই শহরটির সংস্কার করতে হয়েছে। ইউরোপের প্রধান বন্দর বলে এই **শহরে সেই সময়ের** প্রতীক হিসেবে তিনশো ফিট উঁচু মাস্তুলের মতো একটি স্তম্ভ করা হয়েছে মিউনিসিপ্যাল পার্কে। লিফটে করে বা সিঁড়ি দিয়ে তার চূড়া পর্যন্ত

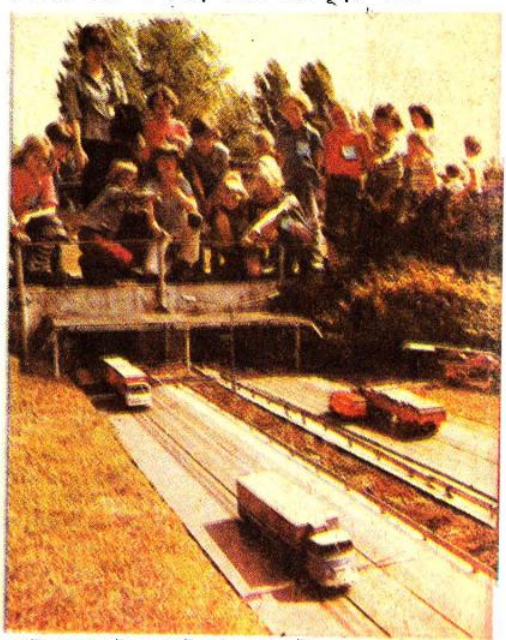

ছোট্ট পথে ছুটছে ছোট্ট বাস আর ট্রাক

ওঠা যায়। সেখানে একটি ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ আছে। চায়ের কাপ নিয়ে বসে পুরো শহরটিকে ওপর থেকে চমৎকার দেখা যায়। আমরা আগে সেখানে গেছি। এই স্তম্ভটিকে তারা সগর্বে বলে, 'ইউরোমাস্ট' বা 'ইউরোপের মাস্তুল'। মাড়ুরাডামের মিনিরাজ্যে দেখলাম তারও নিখুঁত খুদে সংস্করণ রয়েছে।

গাড়ির রাস্তায় যেমন চলমান গাড়ি, রেল লাইনেও তেমন আধুনিক ট্রেন চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। এখানেও সাজ-সরঞ্জাম ত্রুটিহীন। ডাচরা চিরদিনের সমুদ্রপ্রেমিক। জলপথে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস, জলদস্যুতার গল্প তো সবাই জানে। সুতরাং একটি 'মিনি-হল্যাণ্ডে' নৌবন্দর থাকবে না তাও কি সম্ভব। শহরের একপ্রান্তে যখন পৌঁছলাম তার দেখা মিলল। মধ্য গ্রীষ্মের সূর্য মাথার ওপর। দিনটাও অস্বাভাবিক গরম ছিল, এতক্ষণ ঘুরে তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত লাগছিল। সব-কিছু ভুলে গেলাম বন্দরটি দেখে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের রীতিতে সব খুঁটিনাটি নির্ভুলভাবে উপস্থিত। ছোটবড় বিভিন্ন ধরনের জাহাজ, বন্দরের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, বার্থ, জেটি, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক নানারকম সরঞ্জাম, যা আমি সব ভাল করে বুঝিও না, সমস্তই রয়েছে। নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ পরিচালনায় তৈরি। বিভিন্ন নাবিক-পুতুল নিখুঁত পোশাকে যথাযথ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সব মিলিয়ে জীবন্ত এক ছবি। যেন কোনো জাদুকর এক মন্ত্রবলে কর্মব্যস্ত বিশাল একটি বন্দরকে হঠাৎ ছোট করে দিয়েছে। আশ্চর্য দেশের অ্যালিসের মতো।

এক নজরে ছোট শহরের কেন্দ্রস্থল

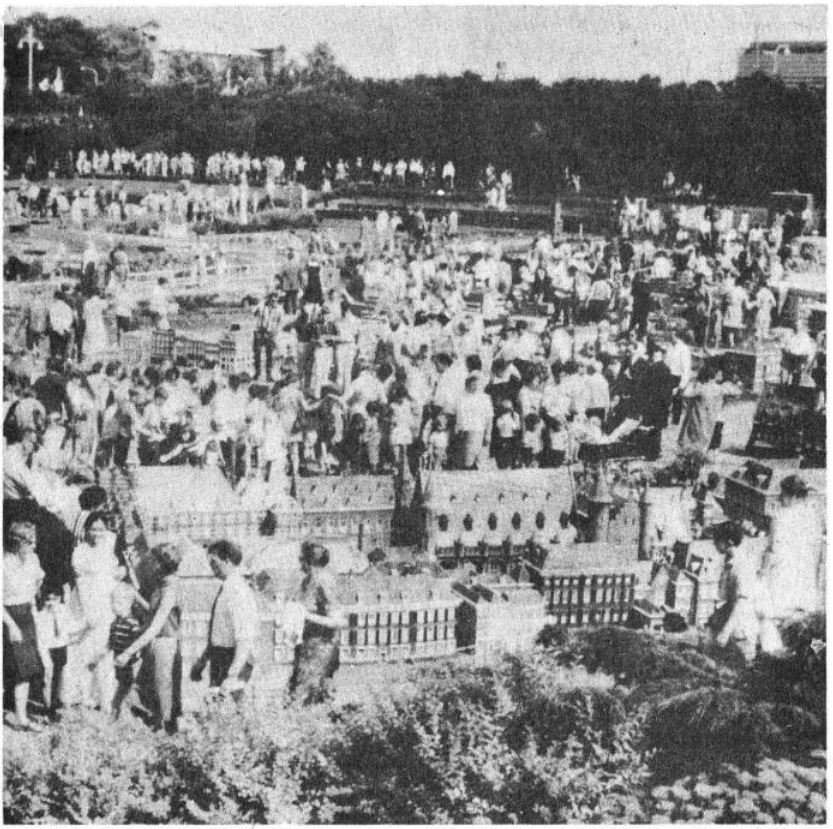

ছোট শহরে পর্যটকদের ভিড়

অনেক জাহাজ আবার যাতায়াতও করছে। অ্যামস্টারডাম শহরে যেমন খাল আছে, এখানেও তার প্রতিরূপ রয়েছে দেখলাম।

মাড়ুরাডামে ভারতীয় দর্শক শুধু আমরাই ছিলাম। দেহাতি লোকের হাইকোর্ট, চিড়িয়াখানা দেখার মতো আমাদের তো সেখানকার সব-কিছুই আশ্চর্য ভাল লাগছিল, তবে কিনা আশেপাশে সাদা লোকদের উত্তেজনাও কম দেখলাম না। আমরা কালা আদমিরা তো বাইরে আবেগ, বিস্ময়গুলো একটু চেপেচুপেই রাখি, পাছে গেঁয়ো বলে ধরে ফেলে এই চিন্তায়। ওদের তো আর সে-সব বালাই নেই, ছোট বড়, তরুণ বৃদ্ধ সবাইকেই দেখলাম দারুণ চমৎকৃত। সব জায়গাতেই চারপাশ থেকে "দারুণ!" "আশ্চর্য!" অপূর্ব!" "ওঃ নো।" ইত্যাদি বিস্ময়ধ্বনি বর্ষিত হচ্ছিল। সুতরাং আমরাও প্রাণখুলে সোচ্চার আনন্দ প্রকাশ করতে দ্বিধা করলাম না।

নৌবন্দরের মতো বিমানবন্দরেও পৌঁছে গেলাম শহরের প্রান্তসীমায়। এখানেও যান্ত্রিক সরঞ্জামের খুঁটিনাটিতে খুঁত নেই। ত্রুটি নেই দ্রুতগতি বিমানের গঠনশৈলীতে। বিমানবন্দরটি পাশ্চাত্ত্য যে-কোনো বড় বিমানবন্দরের ধাঁচে জ্যামিতিক নকশায় তৈরি। বিমানগুলি অবশ্য ওপরে উড়ছে না, তবে বিমানবন্দরের বিরাট চত্বরে ঘুরছে—ওড়ার ঠিক আগে যা করতে হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ট্যাক্সিইং'। বিভিন্ন দরকারি কাজে, যাত্রীদের বিমান থেকে নামার জন্য যে-সব গাড়ি থাকে সেই রকম ছোট ছোট সব গাড়ি কর্মব্যস্ত মৌমাছির মতো

বিমানবন্দরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা ছবিতে মনে হবে সত্যিকারের কোনো **বিমানবন্দর**।

পাঁচ-ছ' ঘণ্টা ঘুরে অবশেষে বাইরে বেরোবার দরজায় পৌঁছলাম। সঙ্গে আমাদের মতোই বহু বয়স্ক ও শিশুর দল। উত্তেজিতভাবে সবাই দ্রষ্টব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করছে। ইংরেজি, ডাচ, জর্মন, ফরাসি, রুশ, জাপানি আরও কতরকম ভাষায় পাঁচমিশেলি কিচিরমিচির। ঢোকার সময়ে লক্ষ করেছিলাম কিছু লোক ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত। ট্যুরিস্ট নয় বলে মনে হল। সংবাদপত্র বা টেলিভিশনের লোক ভেবে মনোযোগ দিইনি। বেরোবার রাস্তায় এখন দেখি ক'ঘণ্টার মধ্যে চটপট প্রিন্ট করে দর্শনার্থীদের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি দেখে দেখে ঠিক লোককে পাকড়াচ্ছে, আমাদের দেশের মন্দিরের পাণ্ডাদের মতো প্রায়। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে 'বেরি চীপ', 'টু গিল্‌ডার্স', 'টেক আ মেমরি' ইত্যাদি পেশাদারি বুলিতে নাছোড় ভঙ্গিতে গছাবার চেষ্টা করছে। শাঁসালো আমেরিকান খদ্দেরদের কাছে বেশি ভিড়। একাধিক লোক

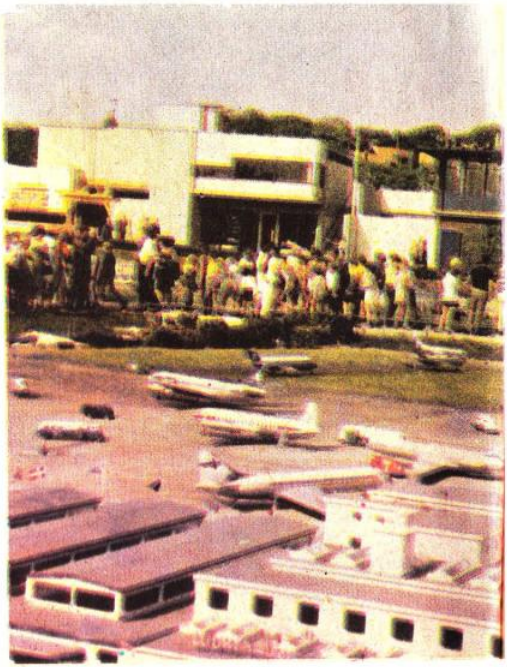

ছোট্ট বিমানবন্দর, রানওয়ের উপরে ছোট-ছোট প্লেন

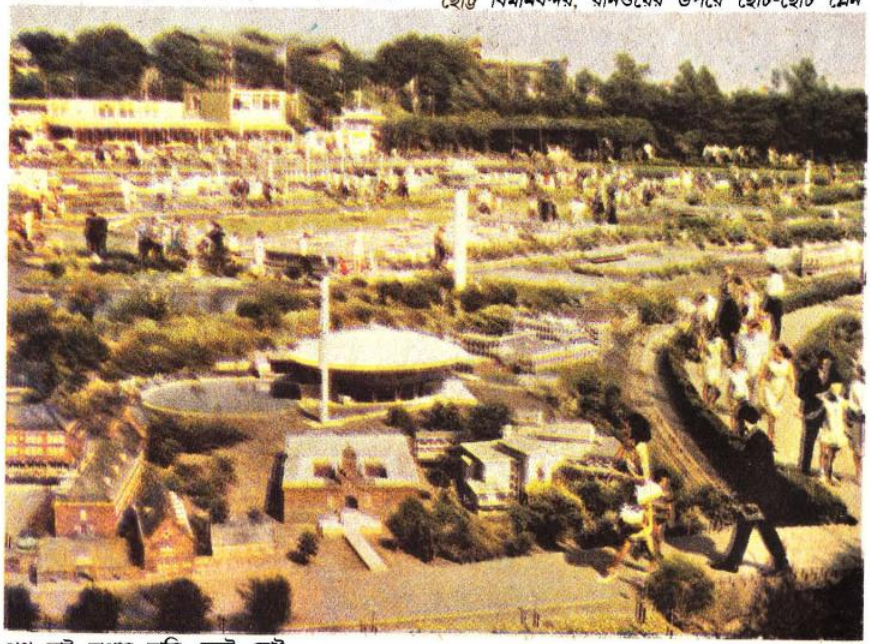

পথ ঘাট বাগান বাড়ি, সবই ছোট

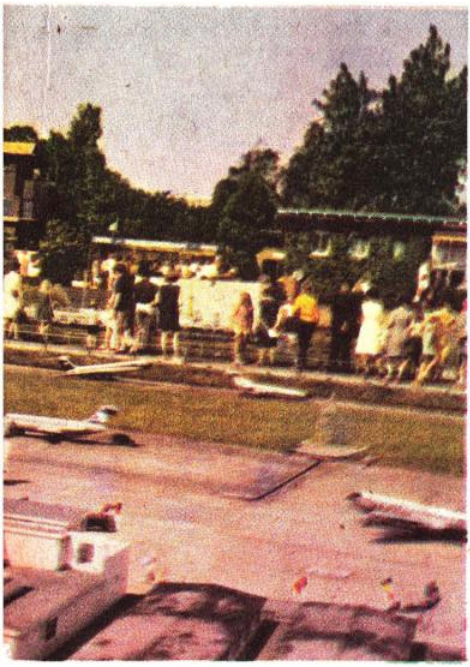

বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি নিয়ে নাকের কাছে দোলাচ্ছে। কেউ বা দরাজ হাতে নিচ্ছে, কেউ আবার আপত্তি জানাচ্ছে, কারণ তাদের নিজেদের সঙ্গেই তো দামি দামি ক্যামেরা। ছোট ছেলেমেয়ে সমেত বাবা-মায়েরাই বেশি ঘায়েল হচ্ছে, কারণ ছোটদের হাতে একবার ধরিয়ে দিলে তারাও আর ফেরত দিতে নারাজ। ব্যবসায়ীরা সে সুযোগ পুরোমাত্রায় নিচ্ছে। তরুণ-তরুণীরা কিন্তু দৃক্‌পাত না করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কেউ সুবিধা করতে পারছে না। আমরাও যথারীতি ঘায়েল হলাম যথাসময়ে। 'বিউটিফুল', 'চার্মিং' ইত্যাদি খোশামুদে কথায় ভিজিয়ে ফেলল। ছবি হিসেবে অত্যন্ত মামুলি হলেও স্মারক **চিহ্ন হিসেবে** নিয়ে ফেললাম একটা। ধন্যবাদ ও টাকা বিনিময় হল। সফল শিকারি উৎফুল্ল হয়ে **আবার** আসার আমন্ত্রণ জানাল। মনে মনে বললাম, জানি না আর আসব কিনা। সারাদিনের উত্তেজনার পর সবাই এখন শ্রান্ত। ছোট শিশুরা অকারণ বায়না করছে। ট্রামস্টপে বেশ ভিড়। পুতুল রাজ্যের মায়াজাল থেকে বাস্তবে পা দিয়ে সবাই বাড়ি ফেরার জন্য উন্মুখ। নিঃশব্দে ট্রাম এসে গেল। দরজা খুলে যেতে সবাইকে ভেতরে পুরে মসৃণ, পিচ্ছিল গতিতে ছুটল দ্যেন হাগ্‌ শহরের দিকে, পেছনে পড়ে রইল কল্পরাজ্য **মাডুরাডাম**।

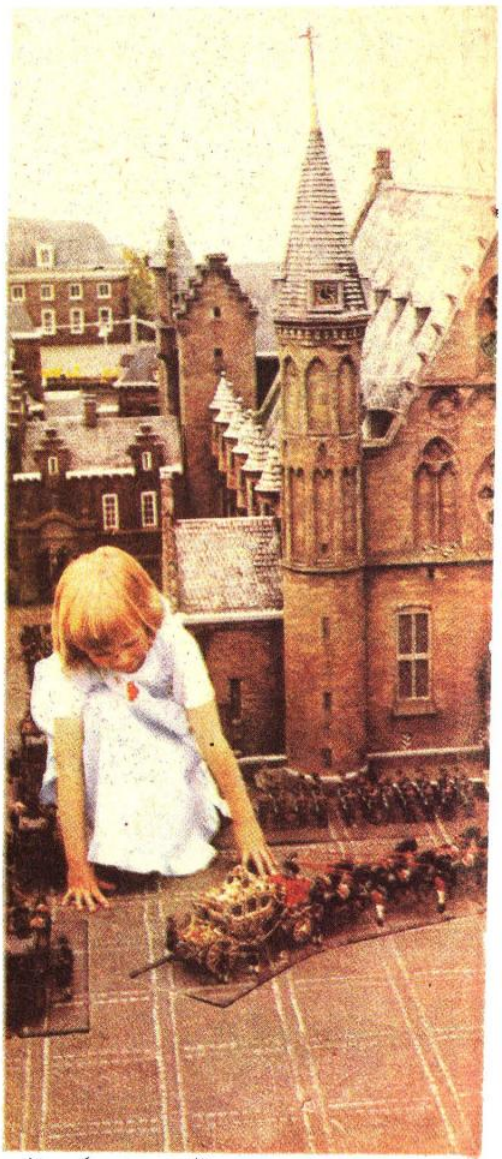

ছোট্ট দুর্গের সামনে ছোট্ট মেয়ে

হেতো ভূতের কথা

বলরাম বসাক

পাংখাকাকুর জ্যাঠামণির এক পিসেমশাই ছিল। সেই পিসেমশাইয়ের মাসতুতো বোনের এক নাতজামাই ছিল। তাঁর যে মামাশ্বশুর অসুরারি তর্কালঙ্কার, তিনি একটা অদ্ভুত ভূতের কথা শুনেছিলেন তাঁর ঠাকমার কাছ থেকে। পুকুরহীন কোনো গ্রামের রাস্তার ধারে যদি কোনো তালগাছ থাকে তো খুউব সাবধান। কারণ তালগাছটা মোটেই তালগাছ নয়। অদ্ভুত এক ভূত তালগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে-দেখতে সেকেণ্ডের মধ্যে গাছটা আর গাছ থাকে না। একটা কনুই পর্যন্ত বিশাল হাত হয়ে যায়। তালপাতা, নাকি তালপাতার ছায়া, নাকি সত্যি-সত্যি হাত, বুঝবার সময় পর্যন্ত দেয় না। খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা হাতই যদি হয়, কটা আঙুল, কত বড় নখ, সেটুকু পর্যন্ত দেখবার সময় দেয় না। টুক করে রাস্তা থেকে কাউকে তুলে নেয় হাতে, তারপর মুঠো করে একেবারে হাওয়া। লোকটার আর হদিশ পাওয়া যায় না। অসুরারিবাবু তাঁর ঠাকমার কাছ থেকে সে গপ্পো শুনেছিলেন পাঁচ বছর বয়স থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আটষট্টিবার। তাই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি ক্যামেরা নিয়ে চলে এলেন এমন এক গাঁয়ে যেখানে একটাও পুকুর নেই। গাঁয়ের পথে চলতে চলতে কোথায় যেন একদিন পাঁচ-পাঁচটা তালগাছ পেয়েও গেলেন। সেগুলোর ফোটো যেই-না তুলতে গেলেন অমনি ক্যামেরাটা মাটিতে পড়ে গেল। আর অসুরারিবাবুও বেপাত্তা।

তারপর?

তারপর, পাংখাকাকুর একজন মেসোমশাই ছিল। সেই মেসোমশাইয়ের পিসতুতো ভাইয়ের নাতবৌ তার যে খুড়শাশুড়ি—তিনিও একটা অদ্ভুত ভূত দেখেছিলেন। দেখেছিলেন মানে ঠিক দেখেননি, দেখবার সময় তাড়াতাড়ি চোখ বুজেছিলেন। তবে মাঝে-মাঝে পিট-পিট করে তাকিয়ে যা দেখার দেখে নিয়েছিলেন। সেই খুড়শাশুড়ির নাম ছিল দোলনচাঁপা। তাঁর নাতির নাম ভীমবল। দোলন-ঠাকমা ভীমবলকে পাখার হাওয়া করছিলেন আর বলছিলেন, "কী খাবি রে ভিমু, গজা খাবি? দরবেশ খাবি? ঘুগনি খাবি?"

ভীমবল শুধু বলল, "হুঁ।"

এল এক ঝুড়ি গজা। পাখার হাওয়া করতে করতে দোলন-ঠাকমা বললেন, "নে—খা—।"

ওমা! কী করে খাবে ভীমবল, হাত বাড়িয়ে একটা গজা তুলতে না-তুলতেই দেখে ঝুড়ি খালি। এল এক ধামা দরবেশ। দোলন-ঠাকমা পাখার হাওয়া করতে-করতে নাকি স্বচক্ষে দেখলেন, ভীমবল হাত বাড়িয়ে একটা দরবেশ

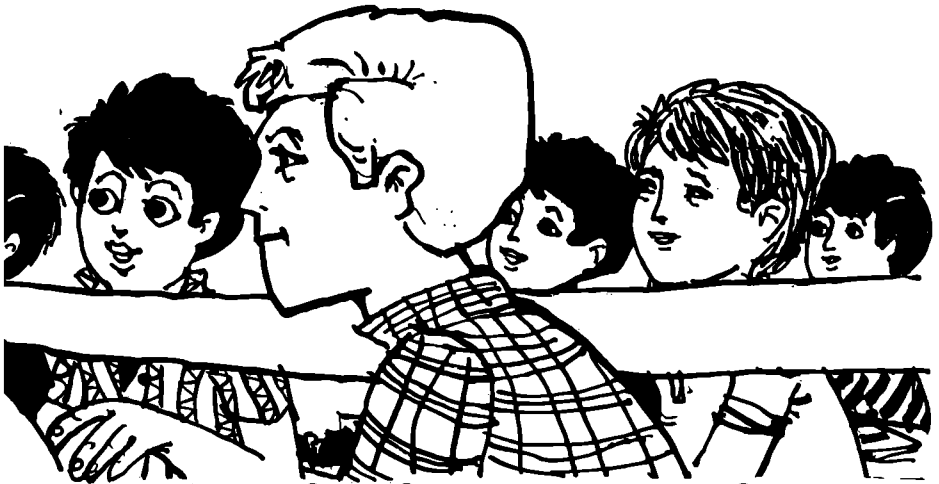

তোলার আগেই ধামা এক নিমেষে খালি। এল এক গামলা ঘুগনি। ওমা, সেও চোক করে মিলিয়ে গেল। খালি গামলাটা পড়ে রইল। দোলন-ঠাকমা ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। চোখ বুজেই ভীমবলকে হাওয়া করতে লাগলেন।

এবারে এল এক ঝুড়ি আম। চোখ পিট-পিট করে তাকিয়ে দোলন-ঠাকমা যা দেখলেন,তা কী বলব। ঐ বাড়িতে খানপাঁচেক হাতপাখা এসেছিল। কিন্তু তার সব হাতপাখাই কি হাতপাখা? দোলন-ঠাকমা চোখ পিট-পিট করে দেখেন, তাঁর হাতপাখাটা একটা চওড়া হাত হয়ে গেল। ব্যাস, অমনি তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলে, আবার পিট-পিট করে তাকিয়ে দেখেন, আমের ঝুড়ি খালি। "ও মা গো—দাদা গো—দিদি গো—পড়ি গো—মরি গো—হাতে-পায়ে ধরি গো" বলতে বলতে দোলন-ঠাকমা হাতপাখা ছুঁড়ে ফেলে, "কোথায় যাবো গো—কী খাব গো" বলতে বলতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ঝুপ করে।

তারপর ভীমবলের মেজমামা জনার্দন পতিতুণ্ডি থাকেন লালগোলায়। চিঠি পেয়ে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলেন। তালপাতার পাখাটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।—"হুঁ, এ নিশ্চয় সেই পাঁচটা তালগাছের, যে-গুলোর হাতে অসুরারি তক্কো প্রাণটা খোয়াল। সে-সব গাছের কোনো একটা পাতা কেটে এই পাখাটা তৈরি হয়েছে।"

তাড়াতাড়ি পাখাটা আর যে-কটা পাখা ছিল সব একসঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হল। একটা হাঁড়ির মধ্যে সেগুলোর ভস্ম ভরতি করে রাখা হল।

অসুরারি তক্কোর ক্যামেরার মধ্যে ছিল পাঁচটা তালগাছের ছবি। সেই ছবি আর তালপাতার পাখার ভস্ম—এ ছাড়া হেতো ভূতের আর কোনো প্রমাণ আছে?

আছে। পাংখাকাকুর মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো বোনের বিয়ে হয়েছিল আড়কাঠিতে। তার জেঠশাশুড়ির ননদের সেজজামাইয়ের জ্যাঠামশাই সন্ন্যেসি হয়ে চলে যান। যাবার আগে অবশ্য পুষ্যি রেখে গিয়েছিলেন বিপুল সম্পত্তি দেখাশুনার জন্যে। সেই পুষ্যির পিসশাশুড়ির মেজদা ভীষণ কুঁড়ে ছিল। দাওয়ায় চাটাই পেতে শুয়ে থাকত আর পাটালি-গুড় দিয়ে চালভাজা কুড়মুড় করে চিবুত। তার নাম ছিল মুণ্ডুনাথ মণ্ডপী। একদিন মুণ্ডুনাথ তালপাতার চাটাই পেতে, তাতে শুয়ে তালপাটালি চুষতে-চুষতে মুড়ি চিবুচ্ছিল, ঠিক ভর-দুপুরবেলায়,বাড়ির দাওয়ায়। অনেক দূরে ন্যাড়া বাঁশবনটা রোদে জ্বলছিল। আর পুকুরের কোনো একধারে পাখি কুব-কুব করছিল। ডান দিকে ছিল কলাগাছ। বড়-বড় কলাপাতা রোদের ওপর কেমন যেন একটা ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ছায়া ফেলেছিল। চারদিকে নির্জন নিস্তব্ধ। কেবল উঠোনে মুড়ি চিবুনোর শব্দ। এমন সময় কে যেন কেঁদে উঠল, "অঁ-অঁ-অঁ, হাঁড়-বজ্জাত মানুষের পোঁ,..., আমাদের ঝাঁড়বংশে শেঁষ করে দিল-অঁ-অঁ—।"

মুণ্ডুনাথ কান পাতল। বাচ্চার কান্নার মতো লাগছে। কেঁদে-কেঁদে কী-সব বলছে। "কুঁড়ুল

আপনার শিশুর সেরা সুরক্ষা

Duckback®
চিলড্রেনস্ রেণওয়্যার

বাবার শিল্পে ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ

naa RW3ABen

দিয়ে কুঁপিয়ে আমাদের কেঁটে ফেঁললি, আঁ-আঁ-ডাঁলপালা দিয়ে পাঁখা বাঁনালি, তাঁ-ও আঁগুনে পুঁড়িয়ে ফেঁললি-ইঁ-ইঁ-ইঁ...”

মুণ্ডু অতশত বুঝল না। এক লাফে দাওয়া থেকে বাইরে এল। দেখল বাঁশবনের ধারে কচুবনের ভেতর একটা ফুটফুটে বাচ্চা “অঁ-অঁ-আঁ-আঁ-ইঁ-ইঁ” করে কাঁদছে। দেখে খুউব দয়া হল মুণ্ডুর। বাচ্চাটার হাত ধরে বাড়ি এল। তালচাটাইয়ে বসতে দিল। তালপাটালি খেতে দিল। আর বাচ্চাটাও গ্যাঁট হয়ে বসতে পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে শুয়ে পড়ল। বলল, “মুণ্ডুডাডা, আঁমি ইঁচকুলে পোঁববো।” মুণ্ডুও সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ইস্কুলে ভরতি করে দিল। ইস্কুলের খাতায় ওর নাম লিখিয়ে দিল, “চাঁদু মণ্ডপী।”

চাঁদু রোজ ইস্কুলে যায়। লাস্ট বেঞ্চে বসে। মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ চাঁদুকে দেখতে পায় না, শুধু দেখে একটা লম্বা হাত লুকিয়ে-লুকিয়ে একে চিমটি কাটছে, ওর মাথায় চাঁটা লাগাচ্ছে। এর কান মলে দিচ্ছে। ওর পেটে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কখনো-সখনো হাতটা লম্বা হতে-হতে লাস্ট বেঞ্চ থেকে দশ-বারোটা বেঞ্চ পেরিয়ে ফার্স্ট বেঞ্চে এসে, সেখানে ফার্স্ট বয়ের বেঞ্চের ওপর টাকা-ডুম, টাকা-ডুম তবলা বাজিয়ে সুড়ুত করে চলে যায়। অঙ্কের মাস্টারমশাই ভাবলেন ফার্স্টবয় বুঝি বেঞ্চে তবলা বাজাচ্ছে। বেচারাকে কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হল। চাঁদু একটু বড় হয়ে ভলিবল খেলতে শুরু করল, তখন সবাই দেখল একটা বিশাল হাত বলটাকে একবারও মাটিতে পড়তে দিচ্ছে না। উলটে চাপ মেরে বিপক্ষ দলকে কাবু করে দিচ্ছে। কারোর সঙ্গে মারপিট বাধলে কেউ-ই চাঁদুকে দেখতে পায় না। খালি একটা হাত এসে দমাদ্দম ঘুষি চালাচ্ছে।

এমনি করে চাঁদু আরো বড় হল। পরীক্ষায় পাস করল। চাকরি পেল। একদিন মুণ্ডুকে বলল, “মুণ্ডুডাঁড়া, আমি বেঁ কোঁববো।

বে কোববে? বলে কী হেতো ভূতের বাচ্চা! মুণ্ডু কিন্তু দিব্যি হাসতে-হাসতে বলল, “আচ্ছা, বিয়ে করবি সে তো খুউব ভাল কথা।” তারপর কোথায় গিয়ে কাকে ধরে, কাকে চিঠি লিখে, কী ভাবে কেমন করে যেন একটা পাত্রী ঠিক করে ফেলল। জগদ্দলের বিখ্যাত নটেশাঁকচুন্নির ছোটমেয়ে ছোটেশাঁকচুন্নি—তার সঙ্গে চাঁদু মণ্ডপীর বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর? তারপর আর কী। গুটিকয়েক সোনারচাঁদ ছেলে হ'ল চাঁদুর। হওয়া মাত্র বিশাল-বিশাল হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল, “অঁ-অঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ, ইঁ ইঁ, ফুঁ-ফুঁ—প্যাঁ,” “ইঁচকুলে যাঁব,” “বঁল কিনে ডাঁও,” “পাঁটালি খাব” “নলেন গুঁড়ের ছন্দেচ খাঁব” —ইত্যাদি।

চাঁদু ওদের ইস্কুলে ভরতি করে দিল। তারপর কলেজে। তারপর ওরা চাকরি পেলে বিয়ে দিয়ে দিল। গণ্ডা-গণ্ডা নাতি-নাতনি হ'ল। হওয়া মাত্র কী চ্যাঁচানি—বঁল কিনে ডাঁও, “বঁনডুক কিনে ডাঁও”, “পাঁপড় খাঁব”, “নলেন গুঁড়ের ছন্দেচ খাঁব”।

এমনি করে হেতো ভূতেরা বেড়ে যেতে লাগল। আর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এখন অবশ্য ওরা হাত লম্বা করতে পারে না। পূর্বপুরুষেরা আগে যা পারত আজকাল অনেকেই তা পারে না, তাই না? তাই ওরা হাত লম্বা করতে পারে না। তবে কতগুলো জিনিস এখনো পারে। যেমন যখন কাঁদে তখন নাকিসুরেই কাঁদে। এখনো কেউ-কেউ নাকিসুরেই আবদার করে। তালচাটাইয়ে আজকাল কেউ শোয় না। তবে তালপাটালি এখনো কেউ-কেউ ভালবাসে। নলেন গুড়ের সন্দেশ অবশ্য এখনো সবাই ভালবাসে। তার মানে পাংখাকাকু বলতে চায়, যারা নাকিসুরে কাঁদে বা আবদার করে বলে, “বঁল কিনে দাঁও-এঁ-এঁ-এঁ,” বা “আঁইচকিরিম খাঁব ইঁ-ইঁ-ইঁ”, কিংবা যারা নলেনগুড়ের সন্দেশ চেটেপুটে খায় অথবা তালপাটালি, তারাই হল হেতো ভূতের বংশধর।

হেতো ভূতের গল্প শেষ হওয়ামাত্র পাপাই ডকরে কেঁদে উঠল, “আর আমি আইচক্রিম খেতে চাইব না।”

টিম্পি কপাল গোঁজ করে বলল, “আমি কেন, যে-ই কাঁদুক নাকিসুরে তো হবেই।”

বাবন দাঁতে দাঁত চেপে পাংখাকাকুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আর আমি! সত্যি বলছি, নলেনগুড়ের সন্দেশ কিংবা তালপাটালি আমার ভীষণ—ভীষণ—ভীষণ ভাল লাগে।

ছবি দেবাশিস দেব

আগের কথা: শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে একটি লোক শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত। ভুয়ো টেলিগ্রাম পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। বংশীর কাছে রহস্যময় মানুষ সিংহিবাবু ও সুখিয়ার খবর পায়। সিংহিবাবুর বাড়িতে ঢুকে শিশির দেখে, বাড়ি ফাঁকা। ফিরতি পথে সাইকেলের ধাক্কা খায়। ঘাড়ে আঘাত লাগে। তারপর...

॥ ১৫ ॥

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

বংশী সাইকেলঅলাকে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু ধরা পড়ার পর সে যেভাবে কাকুতি-মিনতি শুরু করল দেহাতি ভাষায় তাতে বংশী তাকে আলগাই দিল। আর সেই ফাঁকে লোকটা পালাল।

বংশী অবাক। লোকটা পালাল কেন? সাইকেল ফেলে রেখেই পড়িমরি ছুটে মারল! আশ্চর্য!

শিশির ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

"লেগেছে তোমার?" বংশী জিজ্ঞেস করল।

"না, একটু। ঘাড়ের কাছে। বেটা আনাড়ি। নতুন শিখেছে বোধ হয়।"

বংশী টর্চ ফেলে তখনও লোকটার পালাবার পথ দেখছে। সোজা রাস্তায় ছোটেনি; ডান দিকে ছুটেছে। মানে, উধাও হয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। ওর পেছনে তাড়া করা বৃথা।

শিশির বলল, "আলো নেই, ঘণ্টি নেই, লটপট করে সাইকেল চালায়—ভূত একেবারে। নাও, চলো।"

বংশী বলল, "হ্যাঁ, চলো। বেটা সাইকেল ফেলে পালাল।" বলে টর্চ ফেলে সাইকেলটা দেখছিল।

"ভয়ে পালিয়েছে। পরে এসে আবার নিয়ে যাবে। আর ওই তো সাইকেলের দশা।"

বংশী শেষবারের মতন সাইকেলের ওপর আলো ফেলে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল, হাত কয়েক তফাতে কিছু একটা পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল জিনিসটা। তারপরই বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল।

"সর্বনাশ! দেখেছ!" বংশী শিউরে উঠল।

শিশির দেখল। হাতখানেক লম্বা একটা লোহার রড। রডের এক মাথায় লোহার ছোট চাকা। চাকায় দাঁত রয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না শিশির, তবে আন্দাজ করতে পারল, ওটা কোনো অস্ত্র।

বংশী জিনিসটার ওজন দেখল হাতে করে। বলল, "বেশ ভারী। দ্যাখো।"

শিশির হাতে নিয়ে দেখল।

বংশী বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি। বেটার হাতে এই মারাত্মক জিনিসটা ছিল। তোমার মাথায় মারত। মেরে পালাত। খুব জোর বেঁচে গিয়েছ।"

শিশির এবার ভয় পেল। বংশী যা বলছে তা হতেই পারে। অন্ধকারে কেউ যদি সাইকেল চেপে এসে আচমকা তার মাথায় ওই অস্ত্র দিয়ে মারত, কোনো সন্দেহ নেই, জোর জখম হত শিশির। মাথার খুলিই হয়তো ফেটে যেত।

বোবা হয়ে গেল শিশির।

বংশী বলল, "বেটা আমায় বোকা বানিয়ে পালাল। ইস্, আগে যদি এটা দেখতে পেতাম!" বলে আফসোসের শব্দ করল।

"লোকটা কে?" শিশির বলল।

"বুঝতে পারলাম না। চেনা বলে মনে হল না।"

"এখানকার লোক?"

"হতে পারে। নাও হতে পারে। এখানে অনেক নতুন লোকের আমদানি হয়েছে। তাদের কেউ হবে। আমার দুঃখ হচ্ছে বেটাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম।"

শিশিরেরও আফসোস হচ্ছিল।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। বংশী একটু ভাবল। তারপর বলল, "চলো, সাইকেলটাকে কোথাও জমা দিয়ে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দি।"

বংশী রাস্তা থেকে সাইকেল কুড়িয়ে নিল। নিয়ে বলল, "এই সাইকেলটা কালকে আমি থানায় জমা দেব। আর এটাও।" বলে রডটা দেখাল।

ধনিয়ার দোকানে সাইকেল জমা দিয়ে বংশী আর শিশির হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে-হাঁটতে শিশির বলল, "কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যাবে আমি তো বুঝতে পারছি না, বংশী।"

বংশীও ভাবছিল। বলল, "কথাটা ঠিকই। আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার জীবনটাও তেমন নিরাপদ নয়। এই সাঙ্ঘাতিক জিনিস দিয়ে সত্যিই যদি মাথায় মারত, কী হত বলতে পারো?"

"মরেই যেতাম।"

"ঠাট্টা নয়, মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত। যাক, তোমায় একলা ছেড়ে না দিয়ে আমি ভালই করেছি।"

শিশির স্বীকার করল, সে একলা থাকলে সাইকেলঅলা তাকে আরও সুবিধেমতন পেয়ে যেত।

"তুমি আর একলা সন্ধেবেলায় ঘোরাফেরা কোরো না," বংশী সাবধান করে দিল।

"বাড়িতে বসে থাকব?"

"দিনের বেলায় ঘোরাঘুরি কোরো, তবে রাত্তিরে একলা নয়।"

শিশিরের বেশ খারাপই লাগছিল। সে কোনো দিনই গোবেচারি, ভিতু, ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে ছিল না। হাত-পা সেও চালাতে জানে। দু-পাঁচটা চড়-ঘুসি ঝাড়ারও ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এখন সে কেমন ভিতু হয়ে গিয়েছে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল শিশিরের, ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল। না, এভাবে চলতে পারে না। সাহসী হতে হবে তাকে। তবে, আজ যেমন হল, পেছন থেকে যদি কেউ আচমকা আক্রমণ করে, শিশির কী করবে?

রেল লাইনের পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিল দুজনে। রেলের সিগন্যালের আলো দেখা

যাচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা। মাঠ দিয়ে আলো দুলিয়ে কারা চলে যাচ্ছে।

শিশিরের মনে হল, বাবুদাকে এখন তার দরকার। বংশী রয়েছে, তবু বাবুদাকে আনানো উচিত। কালই চিঠি লিখবে বাবুদাকে।

বংশীকে বাবুদার কথা বলল শিশির।

সব শুনে বংশী বলল, "ঠিক আছে। আনাও। আমাদেরও দলে ভারী হওয়া দরকার।"

আরও খানিকটা এগিয়ে বংশী বলল, "কাল কিন্তু থানায় যেতে হবে প্রথমে। থানায় গিয়ে ডায়েরি লেখাব। বুঝলে?"

"আজকের ব্যাপারটাও লেখাবে?"

"নিশ্চয়। আমাদের হাতে এত বড় প্রমাণ।" বলে বংশী সেই লোহার অস্ত্রটা দেখাল।

শিশির আর কিছু বলল না।

শিশিরকে বাড়ির ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বংশী চলে গেল।

ফটক খুলে ভেতরে ঢুকল শিশির। চোখে পড়ল বারান্দায় পিসেমশাই বসে আছেন। পাশে অন্য একজন। দুজনে চেয়ারে বসে। মাঝখানে বেতের টেবিল।

সিঁড়ি দিয়ে শিশির বারান্দায় উঠল।

ডাকলেন শশধর।

দাঁড়িয়ে পড়ে শিশির তাকাল। আবার দেখল ভদ্রলোককে।

গ্রীষ্মের তাপে বিব্রত ?

শীতল প্রশান্তির জন্যে চাই **পোলার ডিলাক্স পাখা**

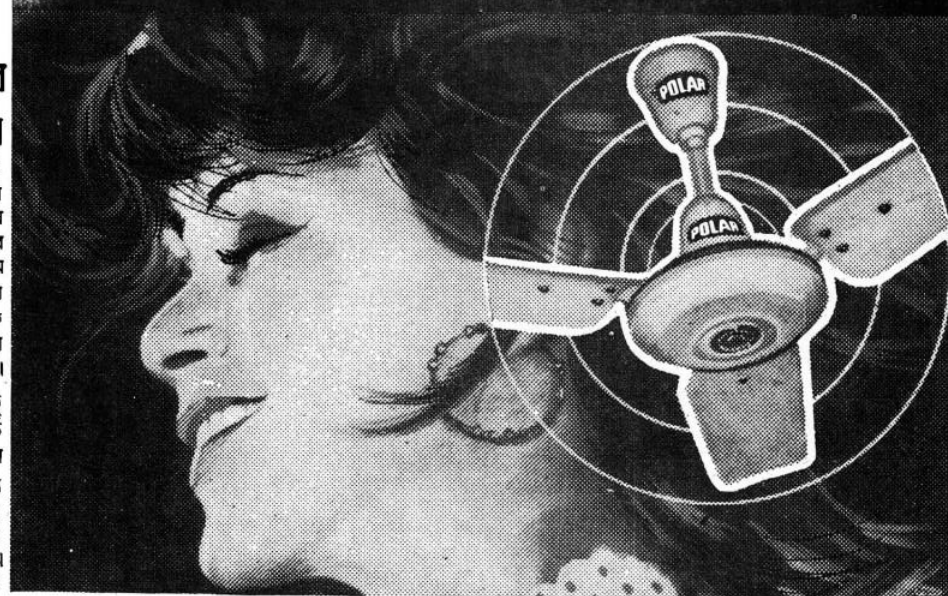

পোলার ডিলাক্স পাখা

আধুনিকতম কারিগরি প্রয়োগ কৌশল দিয়ে ডিজাইন পোলার ডিলাক্স পাখায় পাবেন আভিজাত্যের সঙ্গে আরাম, কঠোর গুণমান নিয়ন্ত্রণের ফলে উঁচুমানের পারদর্শিতা এবং আর্থিক সাশ্রয়ের সঙ্গে চালানোর সহজ পদ্ধতি।

রেগুলেটর ঃ— কনসিলড্ মাউন্টিং-এর পক্ষে সুবিধাজনক। বিভিন্ন পর্যায়ে সমান স্পীড নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা। তুলনায় বিদ্যুৎ খরচের সাশ্রয়। অনেক বেশি টেঁকসই হয়।

অন্যান্য জিনিস **পোলার** সিলিং পাখা, টেবিল পাখা ১২" এসি/ডিসি এক্সজস্ট এবং কেবিন পাখা ও এয়ার সার্কুলেটর

শশধর বললেন, "ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এখানেই থাকেন। কাছাকাছি। এঁর নাম প্রসন্নকুমার সিংহ।"

শিশিরের পা যেন মাটিতে আটকে গেল। এই সেই সিংহিবাবু! না, এই ভদ্রলোক মোটেই গড়ের-মাঠে দেখা সেই লোক নয়। শিশিরের চোখের পাতা পড়ছিল না।

প্রসন্নবাবু শিশিরকে দেখছিলেন। তেমন কোনো আগ্রহ যেন নেই।

শিশিরও লক্ষ করছিল সিংহিবাবুকে। একেবারে ছেলে-ছোকরা নন ভদ্রলোক। তবে তেমন একটা বয়স্কও নন। বছর-চল্লিশের মতন। রোগা মুখ। চোখ দুটি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকার মতন দেখায়। মাথায় অল্প চুল।

প্রসন্ন বললেন, "আপনি কি আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিলেন?"

শিশির অপ্রস্তুত হয়ে গেল। পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল একবার। সত্যি কথা বলবে, না মিথ্যে কথাই বলবে? ইতস্তত করতে লাগল শিশির।

শশধর বললেন, "আরে ওকে আবার আপনি-টাপনি কী! তুমি বলুন।"

শিশির বলল, "আপনার খোঁজে ঠিক নয়...। কে বলল?"

"আমায় তুমি কোথাও দেখেছ?"

প্রশ্নটা একেবারে সরাসরি। শিশিরকে টলিয়ে দেবার চেষ্টা নাকি? শিশির মাথা নাড়ল। "না, কোথাও দেখিনি।"

"তা হলে? আমার খোঁজ করছিলে কেন?"

শিশির চুপ। কোনো জবাবই মুখে আসছিল না।

প্রসন্ন গলায় অদ্ভুত ধরনের শব্দ করলেন।

শশধর বললেন, "আমি একটু আসছি। বোসো, শিশির।"

উঠে গেলেন শশধর। কেন গেলেন বোঝা গেল না। শিশির বসল না। দাঁড়িয়ে থাকল।

"তুমি আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে," প্রসন্ন বললেন, "তোমার সঙ্গে ও ছেলেটা ছিল—ওই যে যার দোকান আছে বাজারে।"

শিশির বুঝল, কথা এড়িয়ে লাভ নেই। সিংহিবাবু পাগলই হোন আর যাই হোন—চোখ খুলে রেখেছেন। হয়তো কানও।

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম," শিশির বলল। "সকালের দিকে গিয়েছিলাম। কাউকে দেখিনি। তাই সন্ধেবেলাতেও গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

একটু ভাবল শিশির। "আমি একজনকে খুঁজছি।"

"কাকে?"

"নাম জানি না।"

"বাঃ, নাম জান না, আন্দাজে আমার বাড়ি চলে গেলে? কেন?"

শিশির রেগে গেল। কেন রাগল সে জানে না। বলল, "তাতে অপরাধ কী হয়েছে?"

"অ-পরাধ!...তোমরা আমার বাড়ির তালা ভেঙেছ।" প্রসন্ন প্রায় ধমকে উঠলেন।

"আমরা ভাঙিনি। তালা খোলাই ছিল। দরজায় ঝুলছিল।"

প্রসন্নর চোখ ছোট হল। "আমি যদি থানায় গিয়ে জানাই তোমরা আমার বাড়িতে ঢুকে তালা ভেঙে ঢুকেছ। তা হলে?"

"যান আপনি থানায়। আমরাও কাল থানায় যাচ্ছি।"

প্রসন্ন থেমে গেলেন। নজর করে দেখলেন শিশিরকে। "তোমরাও থানায় যাবে? কেন?"

"থানায় গিয়ে বলব, কেন।"

প্রসন্ন এবার গলা নরম করলেন, "কেন? আমায় বলতে আপত্তি আছে?"

শিশির বলল, "আপনাকে বলে লাভ নেই।"

"ও, আচ্ছা।"

প্রসন্ন উঠে দাঁড়ালেন।

শিশির দরজার দিকে তাকাল। পিসেমশাই আসছেন না।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার পিসেমশাইকে বোলো, আমি পরে আবার আসব।" বলে সিঁড়ি নামতে-নামতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘোরালেন। তারপর বললেন, "আমি বাড়িতে থাকব কাল। দরকার থাকলে এসো। সকালের দিকে পাবে।"

প্রসন্ন বাগান দিয়ে চলে গেলেন ফটক পর্যন্ত। ফটক খুললেন।

শিশির অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

(ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

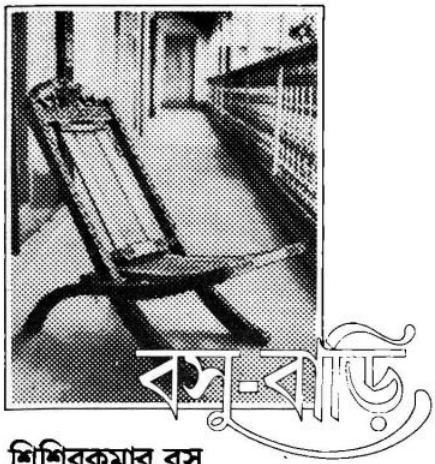

শিশিরকুমার বসু

॥ ২৮ ॥

আমার মনে হয় অনেক অসুবিধার মধ্যে রাঙাকাকাবাবুকে কংগ্রেস সভাপতির কাজ চালাতে হয়েছিল। কংগ্রেসের সদর অফিস ছিল **এলাহাবাদে**। সভাপতির কাজের যা চাপ সেটা সামলাতে তাঁর জন্য কলকাতায় অন্তত দুজন দক্ষ সেক্রেটারির প্রয়োজন ছিল। তিনি অবশ্য মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা ছিল নেহাতই চলনসই, উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত নয়। অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর চিঠিপত্র, অফিসের কাগজপত্র ইত্যাদি খুবই এলোমেলো হয়ে যেত। ফলে পরে সবকিছু একত্র ও সুসংবদ্ধ করে দেশবাসীর জন্য বাঁচিয়ে রাখতে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে খুবই বেগ পেতে হয়েছে।

রাঙাকাকাবাবুর অত্যধিক খাটুনির আরও একটা দিক ছিল। ১৯২১ সালে জনজীবনে প্রবেশ করার সময় থেকে রাজনীতির বাইরেও তিনি কলকাতা ও বাঙলার নানা ধরনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তা সে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও যুবকদের নানা সংগঠন, বিদ্যায়তন, লাইব্রেরি, **ব্যায়ামাগার**—যাই হোক না কেন। তাছাড়া কলকাতা করপোরেশন তো ছিলই, যেটা একাধারে রাজনীতি ও খানিকটা সমাজ সংগঠনের এলাকা ছিল।

রাঙাকাকাবাবু যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত হতেন, তার কাজকর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন, কেবল উপদেশ, পরামর্শ ও বক্তৃতার মধ্যে তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ থাকত না। আমি নিজে তখনও ভেবেছি, কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর তিনি **স্থানীয়** ও প্রাদেশিক নানা কাজ ও সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছেন না কেন। যেমন, কংগ্রেসের সভাপতি হবার পরও তিনি করপোরেশনের **অলডারম্যান** হয়েছিলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর দৈনন্দিন কাজেও তাঁকে বেশ সময় দিতে হত। কত লোকের সঙ্গে যে রোজ দেখা করতেন বলবার নয়। অনেকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হত মোটরগাড়িতে। এমন কী, হয়তো বাইরে সফরে বেরোচ্ছেন, বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কারুর সঙ্গে জরুরি কথা বলবেন। অথবা কাউকে হয়তো বললেন বর্ধমান কি আসানসোল পর্যন্ত চলুন, ট্রেনে কথা হবে।

এমন লোকের ড্রাইভারও জবরদস্ত হওয়া দরকার। ১৯৩৭ সালে কার্শিয়ং-এ আমাদের সঙ্গে থাকার সময় এক বিলেত-ফেরত নেপালি ড্রাইভারকে পছন্দ করে রাঙাকাকাবাবু কলকাতায় নিয়ে আসেন। 'বাহাদুর' ড্রাইভার DKW নামে এক মজবুত জার্মান গাড়িতে রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে ঘুরত। প্রায়ই তো শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরতে হত, বাহাদুর রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে দশবারো মিনিটে এলগিন রোড থেকে হাওড়া স্টেশন পৌঁছে দিয়ে রেকর্ড করত। কতবার যে পুলিসের হাত অমান্য করেছে তার ঠিক নেই। ঝড়ের বেগে গিয়েও যে ঠিক সময়ে পৌঁছতেন তা নয়। অনেক সময় মেল ট্রেনও কয়েক মিনিট দেরিতে ছাড়ত—রাষ্ট্রপতি না-আসা পর্যন্ত গার্ড হুইস্‌ল দিতেন না।

রাঙাকাকাবাবু তো ক্রমাগতই বড়-বড় জনসভায় বক্তৃতা করতেন। মধ্য-কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই সভা হত বেশি। মেডিকেল কলেজ থেকে জায়গাটা তো কাছেই—১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর অনেক বক্তৃতা সেখানে শুনেছি। আমি কিন্তু রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে সভায় যেতাম না, জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাঠে বসে বক্তৃতা শুনতাম। রাঙাকাকাবাবু প্রায় প্রত্যেক

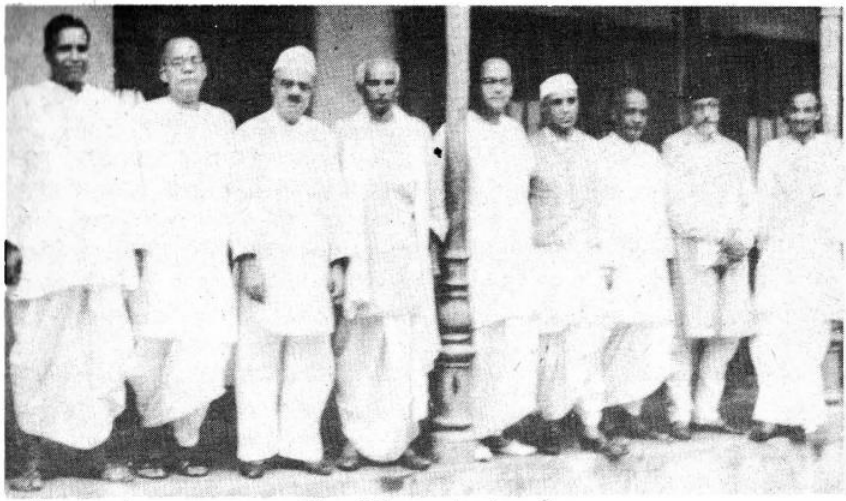

এলগিন রোডে সমবেত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা (১৯৩৮)

মীটিঙেই দেরি করে আসতেন। আমি হিসেব করে দেখেছিলাম, মোটামুটিভাবে আড়াই ঘণ্টা দেরি নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লোকেরা কিন্তু স্থির ও শান্ত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত এবং তাঁর লম্বা-লম্বা বক্তৃতা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেউ নড়ত না।

বক্তৃতার ধরনটা রাঙাকাকাবাবু একেবারেই বদলে ফেলেছিলেন। শুদ্ধ বাংলায় দার্শনিকের মতো বক্তৃতা তিনি জনসভায় আর করতেন না—সহজ ও সোজাসুজি কথাবার্তার ঢঙে বলতেন। মাঝে-মাঝে রসিকতার সুরে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলে সকলকে চমকে দিতেন। যেমন, একদিন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "যদি ইংরেজরা এই যুদ্ধে হেরে যায়, আপনারা কি দুঃখিত হবেন?" কোনো জবাব নেই, সব চুপ। তখন বললেন, "ও, ভয় করছে বুঝি! আমি আপনাদের হয়ে বলে দিচ্ছি, আমরা মোটেই দুঃখিত হব না।" আর একবার প্রশ্ন করলেন, "এই যে জার্মানরা লণ্ডনের উপর জিনিসপত্র ফেলছে, তাতে আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে?" আবার সব চুপ। নিজেই জবাব দিলেন, বললেন, "আপনাদের মনের কথা আমিই বলে দিচ্ছি, এতে আমাদের কোনো কষ্ট নেই।" তিনি জবাবগুলি বলে দেবার পর তুমুল হাততালি পড়ত। আর একটা কথা তিনি প্রায় প্রতি সভায় বক্তৃতার শেষে জিজ্ঞাসা করতেন—স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের জন্য সকলে প্রস্তুত আছেন কিনা। সকলেই একবাক্যে হাত তুলে সম্মতি জানাতেন।

দেশত্যাগ করার আগে যে তিন বছর রাঙাকাকাবাবু এলগিন রোডের বাড়িতে ছিলেন, সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে একজনকার সম্বন্ধে না লিখলেই নয়। আমার খুড়তুতো বোন ইলার কথা। সেই সময় যে স্নেহ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইলা রাঙাকাকাবাবুর **দেখাশুনো** সেবা করেছিল, তার তুলনা পাওয়া শক্ত। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, অসুখে-বিসুখে এবং অনেক ছোটবড় কাজে রাঙাকাকাবাবু অনেকটা ইলার উপর নির্ভর করতেন। মহানিষ্ক্রমণের সময় ইলার ভূমিকা সম্বন্ধে পরে বলব। তবে রাঙাকাকাবাবুর কথা বলতে গেলেই আমার এই কোমলহৃদয় প্রিয় বোনটির কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য বাড়ির সব ছেলেমেয়েরাই যার যেমন সাধ্য রাঙাকাকাবাবুর কাজ করতে কখনও পেছপা হত না। ১৯৩৮-এ **এলগিন** রোডের বাড়িতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর মীটিং হল। বাড়ির সকলেই কাজে লেগে গেল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ১৯৩৮-৩৯-এ আমাদের দেশের দুই মনীষীর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর **সম্পর্কের** ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছিল। একজন হলেন

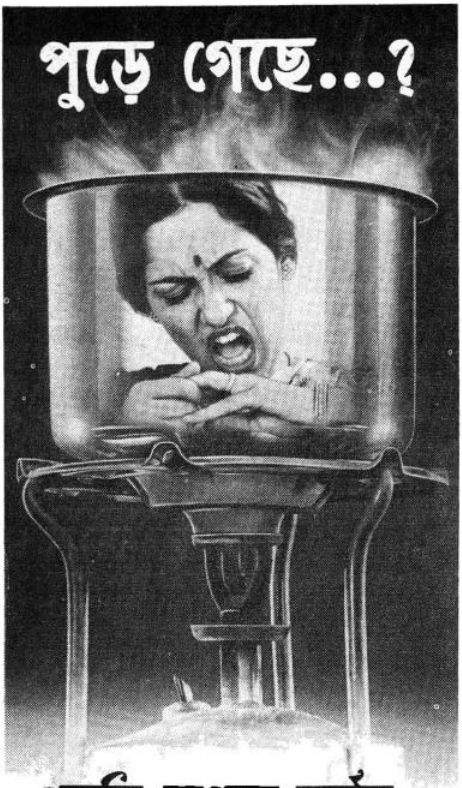

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা!

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল

পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

HTB-BCL-5641

রবীন্দ্রনাথ, আর অন্যজন হলেন গান্ধীজি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে বলেছেন যে, অনেকদিন পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল। পুরনো চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় রাঙাকাকাবাবুরও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু অভিমান ছিল। কিন্তু ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের সব দ্বিধা কেটে গিয়েছে এবং তিনি রাঙাকাকাবাবুকে দেশনেতার সর্বোচ্চ আসনে আহবান করলেন। শুধু তাই নয়, আগামী কালের মুক্তিসংগ্রামের অধিনায়ককে তিনি **সুভাষচন্দ্রের** মধ্যেই দেখতে পেলেন।

১৯৩৮-এর শেষের দিকে যখন রাঙাকাকাবাবু দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের **সভাপতি** পদের জন্য প্রার্থী হবেন বলে ঠিক করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির প্রতিক্রিয়া একরকম তো হলই না, পরস্পরবিরোধী হল বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ডামাডোলে নিজেকে বড়-একটা জড়াতেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, তিনি তাঁর মতামত **গান্ধীজিকে** জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমাদের মঙ্গলের জন্য দেশের দুই আধুনিক-মতাবলম্বী নেতা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

জওহরলালকে ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল **প্ল্যানিং** কমিটীর চেয়ারম্যান করেছেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বললেন, সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেসের সভাপতির পদে রাখা উচিত। গান্ধীজি কিন্তু একমত হলেন না। এক বছর আগেই গান্ধীজি রাঙাকাকাবাবুকে সাদরে সভাপতির পদে আহবান করেছিলেন। কেন গান্ধীজি নিজের মত ও পথ একেবারে পালটে ফেললেন এটা ঐতিহাসিকদের কাছে একটা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা বোঝাপড়ার জন্য জওহরলাল কিছু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। বোধ হয়, সেই সময় গান্ধীজির উপর খুব উগ্র ও কট্টর গান্ধীবাদীদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এদিকে রাঙাকাকাবাবুর স্থির বিশ্বাস হল যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা আপসের চেষ্টা ব্যর্থ করতে তাঁর উচিত সভাপতির পদের জন্য লড়া। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে একটা তীব্র লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠল। (ক্রমশ)

অভিশপ্ত ঝিল

শান্তনু ভট্টাচার্য

শান্তিময়বাবু একা মানুষ। এক সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি করেন। লেখক হিসাবেও একটু নামডাক হয়েছে। দেশভ্রমণ করতে খুব ভালবাসেন। সঙ্গে থাকে একটা মোটা বাঁধানো খাতা। নতুন কোনো ঘটনা শুনলে, নতুন কোনো জিনিস দেখলে লিখে রাখেন, পরে গল্প লেখার সময় সেগুলোকে কাজে লাগান।

এবারও বছরের শেষে বেশ কিছুদিন ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে যাওয়া ঠিক করলেন, হাজারিবাগ।

ডিসেম্বরে হাজারিবাগে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা, গরম জামা থাকা সত্ত্বেও শান্তিবাবুর বেশ কাঁপুনি লাগছে। সবে সকাল হয়েছে, ভাল করে এখনো রোদ ওঠেনি, চারিদিকে সাদা কুয়াশায় ঢাকা। শান্তিময়বাবু স্টেশন থেকে বেরুতেই একটা বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কাঁহা যায়েগা বাবুজি? মেরা গাড়িমে আইয়ে।"

শান্তিময়বাবু তাঁর বেডিং আর সুটকেস গাড়িতে চাপিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে জানালেন, তাঁর যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই, কাছাকাছি কোনো ভাল ভিড়-কম হোটেলে উঠবেন। বুড়োটা কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে জানাল, এ-সময় প্রায় সব হোটেলই ভর্তি, বাবুজি যদি নিরিবিলি পছন্দ করেন তবে কাছেই ওর চেনাজানা একটা চমৎকার বাড়ি আছে। কোনো অসুবিধা নেই, ওর ভাই ভাতুয়া ঐ বাড়ির বাগানের মালি, এখন অবশ্য বাড়িটাও সে দেখাশোনা করে, কারণ মালিক বাইরে থাকে।

শান্তিময়বাবু একাই থাকতে পছন্দ করেন। কাজেই টাঙ্গাওয়ালার প্রস্তাবে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় গেটের সামনে টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। শান্তিবাবু দেখলেন অনেকটা জায়গা জুড়ে রকমারি ফুলের বাগান, তবে গোলাপ বেশি। বাগানটার মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। গেটের পাশেই একতলা দুটো ঘর।

টাঙ্গাওয়ালা ততক্ষণে বেডিংটা নিয়ে এসেছে, আর ওর ডাকাডাকিতে ভাতুয়াও তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সব শুনে সে হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে বলল, এখানে বাবুর কোনো অসুবিধা হবে না। বুড়ো হলেও এখনও সে যথেষ্ট মেহনত করতে পারে। দরকার পড়লে উনি যেন তাকে ডাকেন। সে পাশের ঘরেই রইল।

শান্তিবাবু ভেবেছিলেন দোতলা বাড়িটাতে তাঁকে থাকতে হবে। ভাতুয়া যেন তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে, "ও কুঠি তো বড়া আছে, লেকিন বহুত নোংরা, আপকে লিয়ে এ ঘরই ঠিক আছে বাবুজি।"

শান্তিবাবুও কথাটা মেনে নেন, ঠিকই তো, অতবড় দোতলায় উনি একা মানুষ থেকে কী করবেন, এখানেই থাকা ভাল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বেশ বেলাই হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমনো তাঁর অভ্যাস নেই। একটু গড়িয়ে নিয়ে খাটের ওপর বসে মোটা খাতায় সেদিনের ঘটনা লিখে রাখছিলেন শান্তিময়বাবু। ভাতুয়া রাতের রান্নার যোগাড় করতে শহরের বাজারে গেছে। পেছন দিকের জানলায় একটা ছোট ছেলের গলা শান্তিবাবুর মনোযোগে ছেদ টানল।—"এই যে, শুনুন—"

লেখা বন্ধ করে পেছন দিকে তাকালেন তিনি, একটা চার-পাঁচ বছরের ফুটফুটে ছেলে, গায়ে লাল সোয়েটার, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি খাট থেকে নেমে ছেলেটিকে বললেন, "আমায় বলছ? কে তুমি? কোথায় থাকো?"

এতগুলো প্রশ্নের একটারও উত্তর না দিয়ে ছেলেটা আবার বলল, "জানলা দিয়ে সিল্কির বলটা এই ঘরে চলে গেছে, বলটা দিন।"

শান্তিময়বাবু তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন, "বলটা বোধহয় বাগানের কোথাও আছে, জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলে তো আমি দেখতে পেতাম। কোনো বল তো এ ঘরে ঢোকেনি।" ছেলেটার গাল টিপে আদর করেন তিনি, "তা সিল্কি কে? তোমার বোন?"

ছেলেটা মাথা নাড়িয়ে হাসে, বলে, "আমার কোনো বোনই নেই। ঐ তো সিল্কি বলটা খুঁজে পেয়েছে।"

শান্তিবাবু অবাক হয়ে দেখেন, তাঁরই ঘরের মেঝেতে একটা বিরাট অ্যালসেশিয়ান একটা বল মুখে নিয়ে চিবোচ্ছে। কিন্তু অতবড় কুকুরটা ঘরে ঢুকল কখন? যাই হোক, উনি ভয়ে-ভয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওরে বাবা, কামড়াবে না তো?"

ছেলেটা আবার হাসে, "না না, সিল্কি খুব ভাল, কাউকে কামড়ায় না।" তারপর সে কুকুরটাকে হুকুম করে, "সিল্কি, হ্যাণ্ড শেক।"

কুকুরটা বল মুখ থেকে ফেলে দিয়ে সামনের পা-টা এগিয়ে দেয়। ছেলেটা শান্তিবাবুর দিকে ফেরে, "দেখলে কত ভাল, এবার তুমি শেক করো।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'আপনি' থেকে 'তুমি' এ কেবল বাচ্চারাই বলতে পারে। শান্তিবাবু মনে মনে হাসেন, "তা তোমার নামটা বললে না তো?"

"প্রদীপ ভট্টাচার্য, ডাক নাম বুবাই। ঐ বাড়িটা আমাদের।" বাগানের ভেতরকার দোতলা বাড়িটা হাত দিয়ে দেখায় ছেলেটা, তারপর কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, তুমি কে?"

শান্তিময়বাবু বোঝেন সকালে ভাতুয়া তাঁকে মিথ্যে বলেছে, আসলে ওঁর আগেই এরা বেড়াতে এসে দোতলা বাড়িটার দখল নিয়েছে।

শান্তিবাবুকে চিন্তা করতে দেখে বুবাই নিজেই বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি দাদু।"

"এই তো ঠিক বলেছ।" শান্তিবাবু ছেলেটাকে আদর করেন, "চলো বুবাই, বাগানে ঘোরা যাক।"

বাগানে বেড়াবার নাম শুনেই যেন কুকুরটা এক লাফে উঠে পড়ে, তারপর ওদের পেছনে আসতে থাকে। বেড়াতে-বেড়াতেই গল্প।

বুবাইও একনাগাড়ে বকবক করতে ভালইবাসে। এরই মধ্যে ওকে জানানো হয়ে যায়, ওর কজন বন্ধু আছে। সিল্কি কী-কী খায়। কলকাতার দাদু-দিদারা কে কত ভালবাসেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে, "দাদু, তুমি বরাকর নদী দেখেছ?"

শান্তিবাবু ঘাড় নাড়েন, "না, আমি দেখিনি। তুমি?"

"আমি আর সিল্কি তো বাপির সঙ্গে প্রায়ই যাই।" বুবাইয়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "জানো দাদু, আমাদের বাড়ির পেছনে একটা বড় ঝিল আছে, কত জল। দেখবে চলো না।" শান্তিবাবুর হাত ধরে দোতলা বাড়িটার দিকে টেনে নিয়ে চলে বুবাই। এদিকে তখন শীতের বেলা পড়ে এসেছে, অন্ধকার নেমে আসছে হুড়মুড়িয়ে। এতক্ষণে ওঁরা বড় বাড়িটার সামনে এসে পড়েছেন। বাড়িটার সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় একজন ফর্সা লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক বসে ছিলেন। বুবাই সেই দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ দ্যাখো, আমার বাপি।"

ভদ্রলোক বুবাইয়ের গলার আওয়াজে

শান্তিবাবুর দিকে ফিরলেন। তারপর নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই বুঝি আজ সকালে এখানে বেড়াতে এসেছেন?"

শান্তিবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোক এবার বুবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুবাই বোধহয় আপনাকে খুব বিরক্ত করছে?"

"মোটেই না, বুবাই খুব ভাল ছেলে।"

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। ঝিলের দিকে যেতে যেতে বললেন, "আপনাদের কলকাতার আবহাওয়া ক্রমশই দূষিত হয়ে উঠেছে।"

শান্তিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বুঝি কলকাতায় থাকেন না?"

ভদ্রলোক হাসেন, "আমি তো বরাবর এখানেই আছি, তাছাড়া এটাই তো আমার পৈতৃক বাড়ি। আপনি যে ঘরটাতে উঠেছেন ওটা আমাদের গেস্ট-রুম। আজকাল খুব একটা লোকজন তো কেউ আসে না, তাই অনেকদিন বাদে আপনাকে পেয়ে ভাল লাগছে।"

শান্তিবাবু অবাক হন, সকাল বেলা ভাতুয়া তো এসব কিছু জানায়নি, এমন কী গেস্ট-হাউসে থাকার জন্যে এঁদের মতামত নেওয়া হয়নি। খুবই বাজে ব্যাপার হয়েছে। টাঙ্গাওয়ালাটাও টাকার লোভে, মালিক বাইরে থাকে বলে মিথ্যা কথা বলেছে। তিনি লজ্জিত ভাবে ভদ্রলোককে কিছু-একটা বলার আগেই হঠাৎ বুবাইয়ের চিৎকার শোনা গেল, "সিল্কি, ফিরে আয়, ওদিকে যাস না।"

এতক্ষণ ওঁরা গল্প করতে করতে খেয়াল করেননি বুবাই আর সিল্কি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক বুবাইকে লক্ষ করে ছুটলেন। শান্তিবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে ঝিলের ধারে পৌঁছে দেখলেন, ঝিলে জল নেই, কিন্তু পচা পাঁকে ভর্তি, তারই মধ্যে বলটা পড়ে গেছে, কুকুরটাও তার ভারী শরীর নিয়ে পাঁকের ভিতর লাফ মেরেছে আর ছটফট করতে করতে একটু-একটু করে ডবে যাচ্ছে। সবথেকে মারাত্মক ব্যাপার, বুবাই কুকুরটাকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ পাঁকে লাফিয়ে পড়েছে। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল যে শান্তিবাবু দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এদিকে ভদ্রলোকও ঝিলের মধ্যে নেমে কোনরকমে একহাতে বুবাইকে ধরে ফেলেছেন, কিন্তু পাড়ে উঠতে পারছেন না। শান্তিবাবু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে ধারে গিয়ে হাত বাড়ান ভদ্রলোকের দিকে। উনিও অন্য হাত দিয়ে শান্তিবাবুর হাত চেপে ধরলেন।

ভদ্রলোক এতক্ষণ বুবাইকে ধরে ছিলেন, এবার বুবাইকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে শান্তিবাবুর হাতটা চেপে ধরে পাঁকের দিকে টানতে থাকেন। ওদিকে বুবাই একগলা পাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, "এসো-না দাদু, আমাদের সঙ্গে থাকবে।"

শান্তিবাবুর মাথাটা ঘুরে ওঠে। ভদ্রলোকের চোখ দুটো কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, ফিসফিস করে বলেন, "অনেকদিন পরে গল্প করার লোক পেয়েছি, চলে আসুন আমাদের মধ্যে।"

পাঁকের অতলে ডবে যাওয়ার ঠিক আগে শান্তিবাবুর মনে হল, কে যেন তাঁকে পেছন থেকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে শক্ত পাড়ের ওপরে টেনে আনল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন, চারদিকে অনেক লোক। আস্তে-আস্তে তিনি সব কিছু শুনলেন। আজ প্রায় বছর-তিনেক আগে ঐ ঝিলটার পচা পাঁকের মধ্যে ঐ বাড়ির মালিক, তাঁর ছেলে আর তাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই থেকেই বাড়িটা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ ঘটনার পর থেকে অনেকেই অনেক কিছু ভুতুড়ে ব্যাপার দেখেছে এখানে। তাই বাড়িটাতে কেউ আসতে চায় না। শান্তিবাবুকে নতুন লোক পেয়ে টাকার লোভে ভাতুয়া আর ভাই টাঙ্গাওয়ালা এখানে এনে তোলে। এ-সব জায়গা সন্ধের সময় এমনিতেই ফাঁকা হয়ে যায়, ওঁর ভাগ্য ভাল যে, আজ ঠিক ঐ সময় জনাচারেক লোক ওঁকে ঝিলের কাছে দেখতে পায়। তাদেরই একজন ওঁকে ঝিলের পাঁকের দিকে নেমে যেতে দেখে পেছন থেকে এক ঝটকায় টেনে তোলে।

কিন্তু সব কথা শোনার পরও ফর্সা, লাল টুকটুকে সোয়েটার পরা বুবাইয়ের জন্যে মনটা কেঁদে ওঠে শান্তিময়বাবুর।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পশুবর্ষ

নবকুমার বসু

আজবপুরের মাননীয় অরণ্য-মন্ত্রী জঙ্গলে যাবেন। আন্তর্জাতিক পশুবর্ষ উপলক্ষে তিনি বন্যপ্রাণীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। জীবন বিপন্ন করে, ভয়ংকর সব জন্তুজানোয়ারের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন মন্ত্রী-মশাই।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছপালা ঝোপঝাড় কেটেছেঁটে খানিকটা পরিষ্কার করা হল। তৈরি হল ছোট্ট এক মঞ্চ। অনেক দূরে ফরেস্ট অফিসারের কোয়ার্টার্স থেকে বিদ্যুতের তার টেনে আনা হল। লাইট, মাইকের বন্দোবস্তও পাকা।

জঙ্গলের পশুরা এমন ঘটনা আগে ঘটতে দেখেনি। দুদিন ধরে লুকিয়ে-চুরিয়ে তারা সব কাণ্ডকারখানা লক্ষ করল। জায়গা পরিষ্কার, বাঁশ পোঁতা, ছাউনি টাঙানো, সব দেখল আড়াল-আবডাল থেকে। কিন্তু সন্ধেবেলা হঠাৎ যখন পরীক্ষা করার জন্য জোরালো আলো জ্বলল, জীবজন্তুরা সব অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল। এ আবার কী ব্যাপার রে বাবা। গাছের মাথায় পাখির ছানারা চি চি করে উঠল। হাতি শাঁখ বাজাল, খরগোশ বেচারা ছোটাছুটি করে পালাতে লাগল, বাঘ-সিংহের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। খুব স্বাভাবিক। জংলি জীবনে তারা সূর্যের আলো আর জ্যোৎস্না ছাড়া আলো দেখেনি। নীরবে তারা সব অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা যাক আর কী কী ঘটে। উত্তেজনা বিস্ময় আর কৌতূহলে সবাই সচকিত।

পর দিন বনে মন্ত্রী-মশাই এলেন। জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, ততদূর

মোটরগাড়ি আসে। কিন্তু তারপর ? মন্ত্রী-মশাই গাড়ি থেকে নেমে তাঁর লোকজনদের বললেন, "চলো হে, একটা দিন না হয় সকলে বনের পথে হেঁটেই যাই। কতই বা দূর আর ? তাছাড়া জীপগাড়ির আওয়াজে আমাদের পশু-ভাইয়েরা ভয়টয়ও পেয়ে যেতে পারে।"

সার বেঁধে সবাই তখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চললেন মিটিং করতে। মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পি·এ· আর সেক্রেটারি তো আছেনই। আরও আছেন কয়েকজন বন্দুকধারী সেপাই। বলা তো যায় না, বনজঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি কোনো গোলমাল বেধে যায়।

শীতের ছোট বেলা। তিনটের মধ্যেই সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। নিস্তেজ রোদে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে ওঁদের বেশ লাগল। খানিক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সভার মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন। মন্ত্রী-মশাই আসবেন বলে আগে থাকতেই সেখানে কিছু লোকজন ছিলেন। তাঁরা ফুলের মালা পরিয়ে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর মঞ্চের ওপর বসালেন। খুব খুশি মন্ত্রী-মশাই। গভীর অরণ্যেও এমন চমৎকার সভার আয়োজন তাঁর খুব পছন্দ হল।

দিনের আলো তখনও রয়েছে। তবু স্থানীয় একজনকে ডেকে মন্ত্রী বললেন, "এক কাজ করুন; আন্তর্জাতিক পশুবর্ষে আমরা যে জঙ্গলের পশুপাখিদের জন্য সত্যই কিছু করতে চাই, এটা ওদের বোঝানোর জন্যই সব লাইটগুলো জ্বেলে দিন। তারপর বরং সভার কাজ শুরু করা যাবে।"

গাছপালার মাথায় সবে অন্ধকারের একটু ছোঁয়া লাগছে। তখনই একসঙ্গে অনেকগুলো বড় বড় আলো জ্বলে উঠল জঙ্গল উদ্ভাসিত করে। খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন মন্ত্রী। একজন তাড়াতাড়ি মঞ্চের উপর উঠে মাইক ধরে, হ্যালো মাইক টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রী··· বলে টেস্ট করলেন। গমগমে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল দিক্‌বিদিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই, হঠাৎ অনভ্যস্ত আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়ে সব পাখিরা গাছের ডালপালা ফাঁক-ফোকর ছেড়ে ডানা ঝাপটিয়ে প্রচণ্ড কিচিরমিচির করে উড়তে লাগল।

মন্ত্রী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "থাক, থাক, আর টেস্ট করতে হবে না। সব ঠিক আছে। এখনই আমি বক্তৃতা শুরু করব।"

সেক্রেটারি তখন এগিয়ে চাপা গলায় মন্ত্রীকে বললেন, "কিন্তু স্যার, বক্তৃতা যে করবেন, আমাদের শ্রোতা জীবজন্তু-ভাইয়েরা কেউই তো এখনও আসেননি।"

মন্ত্রী আবার বিরক্ত হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "এদিকে যে অন্ধকার হয়ে আসছে। সারা রাত কি এই জঙ্গলে বসে থাকব ? এখনই মশা ছিঁড়ে খাচ্ছে।" গলার স্বর পালটে নিয়ে মন্ত্রী আবার বললেন, "আমার বক্তৃতা তো শুরু করে দিই, তারপর দেখা যাবে জীবজন্তুরা সব আস্তে আস্তে জড়ো হয়েছে। ভালবাসা দিয়ে সকলকেই কাছে টানা যায়।"

মন্ত্রী-মশাই উঠে দাঁড়ালেন। হাতের কাছে মাইক। দু চোখের সামনে খোলা ফাঁকা জায়গা। দু-একজন সেপাই এদিক-ওদিক বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বড়-বড় আলো জ্বলছে।

মন্ত্রী-মশাই আরম্ভ করলেন, "আমার প্রিয় বন্য পশুপাখি বন্ধুগণ, আন্তর্জাতিক পশুবর্ষ উপলক্ষে আজকের এই উজ্জ্বল সন্ধ্যায় আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"

গমগমে আওয়াজ শুনেই আবার হাজার-হাজার পাখি ডানা ঝটপট করে উড়তে লাগল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কিচিরমিচির ডাকে কান ঝালাপালা করে দিল। পালক উড়ে এসে পড়ল সামনের ফাঁকা মাঠে।

মন্ত্রী-মশাই এবার বেশ বিরক্ত হলেন। কিন্তু তিনি দমে গেলেন না। পাখিদের ওড়াউড়ি একটু থামতেই আবার বললেন, "জীবজন্তু ভাইয়েরা, আজকের এই শুভলগ্নে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এই জঙ্গলের মধ্যে দিনের পর দিন আপনারা কীরকম কষ্ট করে···"

গলা চাপা পড়ে গেল মন্ত্রী-মশাইয়ের। কোথায় গেল পাখিদের ডানা ঝটপট, ক্যাঁ ক্যাঁ ছাড়াও এবার হুক্কা হুয়া, কোঁয়া কোঁয়া, ফরর-ফরর এই রকম নানা রব উঠছে। এদিক-ওদিক তাকালেন মন্ত্রী। মনে হল তাঁর বিরক্তির সঙ্গে এবার কিছু ভয় মিশেছে। তাঁর

লোকজনেরা সজাগ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখছেন। কিন্তু বক্তৃতা থামিয়ে দিলে মন্ত্রী-মশাইয়ের মান থাকে না। একটু ইতস্তত করে তিনি গলায় মধু ঢেলে ফের শুরু করলেন। "পশু ভাইয়েরা, আমরা আপনাদের জন্য ঘর বানাব। নোংরা জলপান করে আপনারা অসুস্থ হন। আমরা পরিষ্কার মিঠে জলের পুকুর কাটাব। আপনাদের চিকিৎসার জন্য..."

অসম্ভব। শত-শত বন্যপ্রাণীর গর্জন আর পাখিদের ডাকে মন্ত্রী-মশাইয়ের কথার একবর্ণও আর বোঝা গেল না। আর ক্রমশই আওয়াজ বাড়ছে এবং এগিয়ে আসছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু ছাড়া সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। মন্ত্রী-মশাইয়ের মনে হল ঐ অন্ধকারের মধ্যে লাল সবুজ বাল্বের মতন বন্যপ্রাণীর চোখ তিনি দেখতে পেলেন। হয়তো বন্দুকধারীদের দেখে তারা সামনে আসছে না, কিন্তু কাছেপিঠেই ঘোরাফেরা করছে আর গর্জাচ্ছে। ভয়ার্ত চোখে মন্ত্রী দেখলেন, তাঁর দলের লোকজনেরাও আতঙ্কিত। বোধহয় পালাবার মতলব আঁটছে। বলা যায় না, তিনি বক্তৃতা না থামালে হয়তো তাঁকে ফেলে রেখেই দৌড় দেবে। শীতেও মন্ত্রী-মশাইয়ের কপালে ঘাম দেখা দিল। পা কেঁপে উঠল। আর ঠিক তখনই খুব কাছের থেকে গম্ভীর মেঘের গর্জনের মতো একটা হাড়-কাঁপানো আওয়াজ সকলের কানে এল। হালুম!

মন্ত্রী-মশাই এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। নিজের ধুতি গুটিয়ে পিছন ফিরেই মঞ্চ থেকে একলাফ। একেবারে মাটিতে। কোনোমতে দাঁড়িয়ে উঠে রেগে বন্দুকধারীদের বললেন, "কী করছ তোমরা অতদূরে দাঁড়িয়ে! এখনও বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে! এসো তাড়াতাড়ি এদিকে। কিস্যু নেই তোমাদের মাথায়!"

অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, "চলো হে, চলো সব তাড়াতাড়ি। কাছে-কাছে থাকো।" ভয় রাগ আর ঘেন্না একসঙ্গে মিশিয়ে মন্ত্রীমশাই বললেন, "জন্তু-জানোয়ারগুলো আর মানুষ হল না। যত্তসব অশিক্ষিত, মূর্খ! কে এদের ভাল করবে!"

ছবি রতন সেন

খেলার মাঠের ডিসিপ্লিন

তোমরা ছোটরা সবাই তো খেলাধূলো কর। খেলাধূলো করলে যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে একথা সকলেরই জানা। কিন্তু খেলাধূলোর আরও একটা দিক রয়েছে। সে দিকটা পরে বড় হ'য়ে জীবনে বড় কাজে আসে।

সেটা কি জান? শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন শেখা। বড় হয়ে এই শৃঙ্খলার বড় অভাব দেখা যায় সর্বত্র। বাসে ট্রামে নামা-ওঠার কথাই ধর না কেন। ভীড়ের জায়গাগুলোতে আমরা নিজেরাই যদি লাইনে দাঁড়িয়ে নিই তাহ'লেই আর অমন বিশৃঙ্খলা হয় না। কিন্তু সে কথা আর কে মনে রাখে? আর আছে "টিম-ওয়ার্ক" শিক্ষা। যাকে আমাদের ভাষায় সহজ করে বলে "দশে মিলি করি কাজ..."। এ জিনিসটাও কিন্তু আমাদের জীবনের পক্ষে খুবই জরুরী।

এরপর হ'লো জয়-পরাজয় দুটোকেই সহজভাবে মেনে নেবার শিক্ষা। সে শিক্ষা খেলা-ধূলোর মাঠের বাইরেও জীবনের বড় মাঠে বড্ড কাজে লাগে। শুধু তো আর বেছে বেছে জয়ই আমাদের ভাগে জোটে না। সারা জীবনে বারবার নানান বিপর্যয় পরাজয় হ'য়ে আমাদের সামনে এসে জোটে। তখন সেগুলোকেও "হার-জিৎ তো আছেই" এই মনোভাব নিয়ে মেনে নিতে পারলে জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

মনে রেখো খেলার মাঠের "ডিসিপ্লিন" যদি জীবনভোর তোমার সঙ্গে থাকে তাহ'লে তুমি একটা সার্থক খেলোয়াড় বটে। তা সে তুমি গোল খেয়েই থাক, বা দিয়েই থাক।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ., ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।)

বানানের ছড়া

দেব সেনাপতি

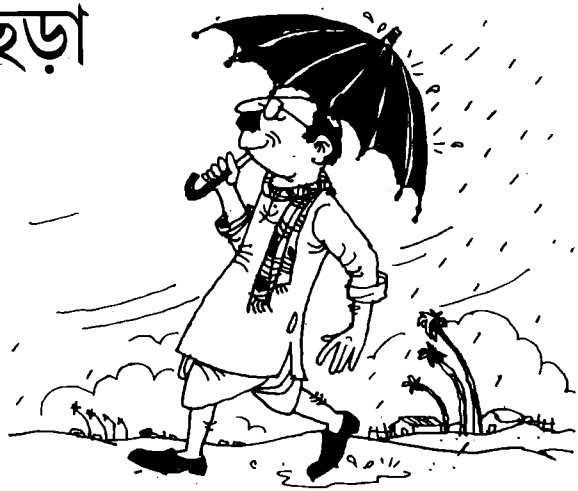

উ

দুর্গা বলে শম্ভুচরণ
ভুবনডাঙার মুখে
অন্যমনে ভুল করে পথ
চলতেছিলেন সুখে।
মুষলধারে কুটিল বেগে
বর্ষা এল রুখে,
পুণ্যে প্রভুর ছত্র ছিল,
ভরসা পেলেন বুকে।

উ

শূন্যে মেঘের মাদল বাজে
ময়ূর নাচে দূর্বাদলে,
নদীর কূলে নূতন বধূ
চমকে দেখে দূর-বাদলে।
পূর্বদিকে পূজায়-বসা
ভণ্ড বক এক কৌতূহলে
ঊর্ধ্বে চেয়ে মূর্ছা পেয়ে
মূর্খ গিয়ে পড়ল জলে।

★

যে-লোক দ্যাখো স্থূল কিংবা মূঢ় কিংবা
ক্রূর কিংবা রূঢ়,
তাদের কাছে ঊহ্য রেখো সেই কথা, যা
সূক্ষ্ম এবং গূঢ়।

ঊঊ/ঊঊ/ঊঊঊ

শেষের মুহূর্তে ডাকি
'রক্ষা করো হে মধুসূদন!'
কোথা নূপুরের ধ্বনি,
মুমূর্ষুর অরণ্যে রোদন!

ছবি দেবাশিস দেব

সদাশিব উঠে বসে···

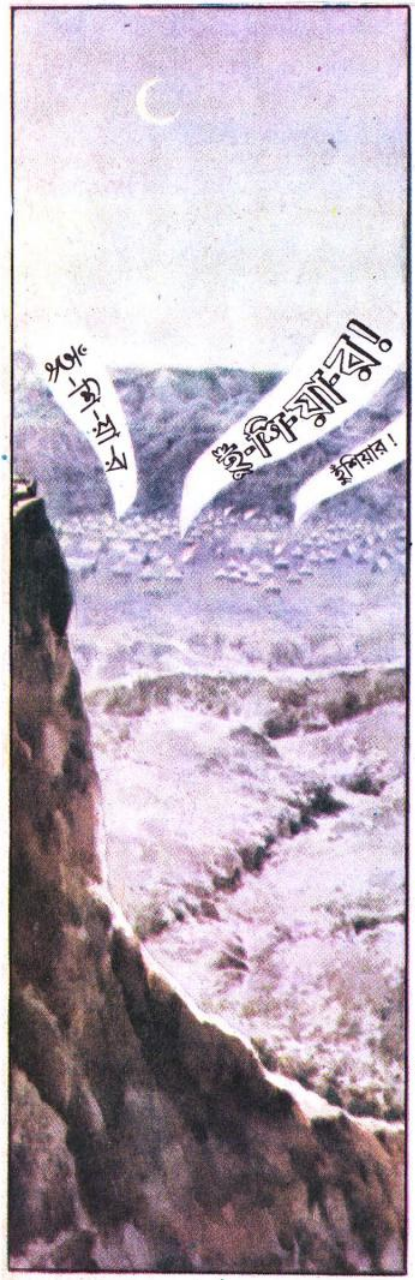

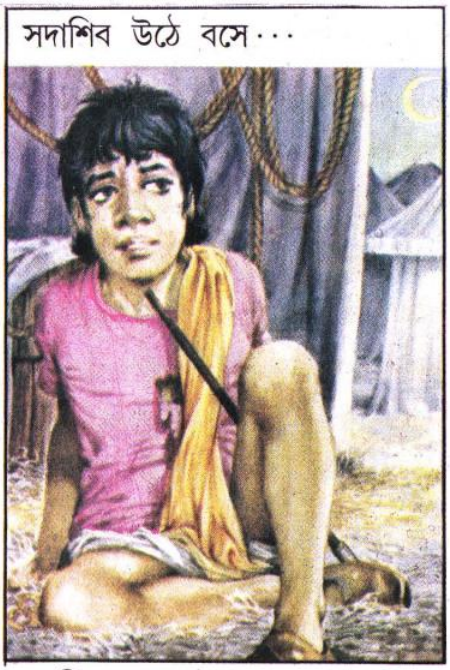

চকমকি পাথর আর নারকেল-দড়ি সঙ্গে নেয়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

হাঙরের মুখ থেকে একটি ছেলেকে বাঁচিয়েছে রয়। কিন্তু তার বাঁ পায়ে ব্যথা। ফোর্ট মারেতে যাবার পথে বাসের মধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে...
কপাল পুড়ে যাচ্ছে!
এক শো মাইলের মধ্যে কোনো শহর নেই।
ড্রাইভার, ধারেকাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না?
কাছে একটা ছোট্ট বসতি আছে।
সেখানেই চলো!
একটু বাদে...
এ কী রকম বসতি রে বাবা!
লোকজন তো দেখছি না!
কাসাওয়ারি বসতি
পশমের কারখানা....
লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে...
রয় যাকে বাঁচিয়েছিল, তার বাবা!
লোকটির নাম বিল কেয়ার্নস। রয়কে দেখে বললেন...
এখুনি ওকে ভিতরে নিয়ে যান।
রয়কে ভিতরে নিয়ে
রয়কে ভিতরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল...
বাঁ পা ফুলে গেছে!
জুতো কেটে খুলে নাও!
খানিক বাদে...
মনে হচ্ছে, পায়ে জেলিফিশ লেগেছিল!
বিষাক্ত!

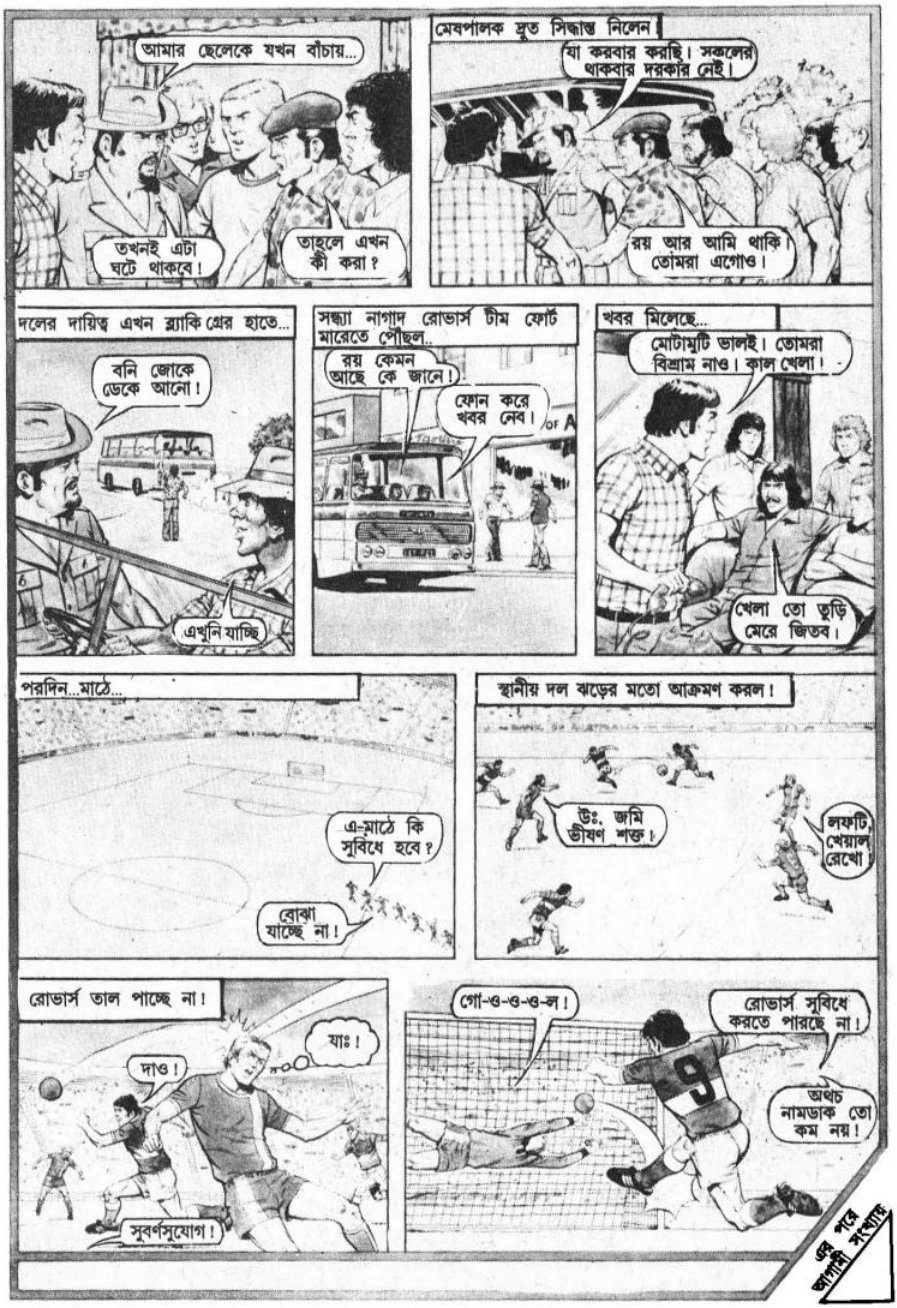
আমার ছেলেকে যখন বাঁচায়...
তখনই এটা ঘটে থাকবে!
তাহলে এখন কী করা?
মেষপালক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন
যা করবার করছি। সকলের থাকবার দরকার নেই।
রয় আর আমি থাকি। তোমরা এগোও।
দলের দায়িত্ব এখন ব্ল্যাকি গ্রের হাতে...
বনি জোকে ডেকে আনো!
এখুনি যাচ্ছি
সন্ধ্যা নাগাদ রোভার্স টীম ফোর্ট মারেতে পৌঁছল..
রয় কেমন আছে কে জানে!
ফোন করে খবর নেব।
খবর মিলেছে...
মোটামুটি ভালই। তোমরা বিশ্রাম নাও। কাল খেলা!
খেলা তো তুড়ি মেরে জিতব।
পরদিন...মাঠে...
এ-মাঠে কি সুবিধে হবে?
বোঝা যাচ্ছে না!
স্থানীয় দল ঝড়ের মতো আক্রমণ করল!
উঃ, জমি ভীষণ শক্ত!
লফটি, খেয়াল রেখো!
রোভার্স তাল পাচ্ছে না!
যাঃ!
দাও!
সুবর্ণসুযোগ!
গো-ও-ও-ও-ল!
রোভার্স সুবিধে করতে পারছে না!
অথচ নামডাক তো কম নয়!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

গালাগাল করছে! ছিঃ!

তাঁবু ওঠাও। দিন দুয়েকের মধ্যেই পাহাড়ি এলাকায় গা ঢাকা দেব।

তুমি আমাদের বন্দী!

ইতিমধ্যে

ঠিক পথে এগোচ্ছি তো?
নিশ্চয়!

নাক-বরাবর যেতে বলেছিল।
তাই তো যাচ্ছি! ওই দ্যাখো গাছ আর ডোবা।

ওইখানে থেমে রেডিয়েটরে জল ভরব।

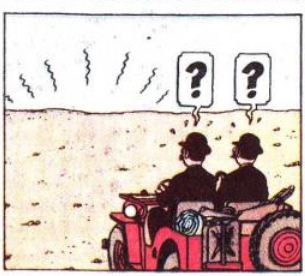
? ?

যাব্বাবা! মরীচিকা!
তাই তো! অদ্ভুত ব্যাপার!

যাক গে, সিধে তো চালিয়ে যাই....

ওই দ্যাখো তেল অল এসদি শহর! ওখানে থেমে জল খেয়ে নেব!
ঠিক বলেছ!

যাব্বাবা! এটাও মরীচিকা!

মনে হচ্ছে সামনের এই গাছটাও মরীচিকা!

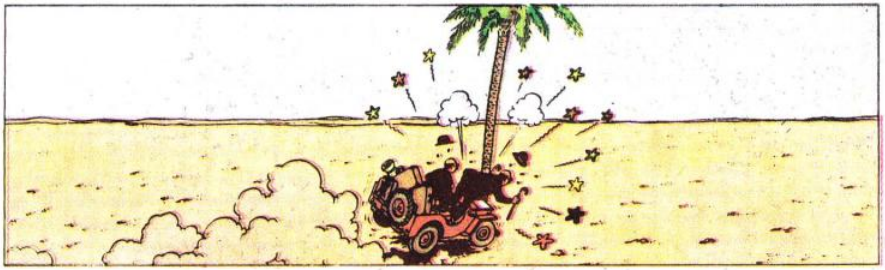

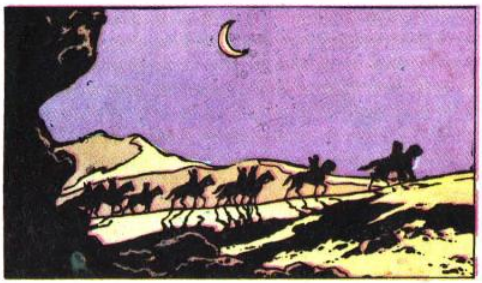

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

	১	২		৩	৪	
৫		৬				
৭				৮		
৯	১০	১১			১২	১৩
	১৪			১৫		
১৬				১৭		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সামুদ্রিক প্রাণী থেকে মঙ্গলবাদ্য। (৩) উপনাম। (৬) পথের রাজা। (৭) শিশুর মুখে যখন ফোটে তখন মা-বাবার কী আনন্দ! (৮) সাবধান, উলটে থাকলেও আসলে কিন্তু বিষ। (৯) স্নেহ। (১২) জলপ্রবাহ। (১৪) চাঁদোয়া। (১৬) মাংস। (১৭) লাট্টুর সঙ্গে যে-ঘোড়ার মিল।

উপর-নীচ : (২) অনাবৃষ্টির পরিণাম। (৩-৪) পর-পর দুটি সমার্থক শব্দ, খুব শক্ত কিন্তু। (৫) অস্থায়ী আস্তানা। (১০) অন্ধকারে পথ-দেখানো আলো। (১১) কোন্ ভাষার অর্থ হুকুম পালন? (১৩) আধো-আধো ঘুম। (১৫) ছোট গোলাকার ফল।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ক্ষু	র	প্র		দা	মি	নী
দ্র		স	র	মা		প
	অ	ন্ন		মা	কু	
ট	ঙ্ক				হে	লে
	ন	খ		পা	লি	
মো		নি	শা	না		প
ম	গ	জ		মা	ল	ণ্ড

ধাঁধা

প্রথম ধাঁধা ॥ তিরিশ ফুট গভীর একটা কুয়ো। সেই কুয়োর তলায় রয়েছে একটা শামুক। কুয়োর পিছল দেয়াল বেয়ে রোজ শামুকটা ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। দিনের বেলা সে বহু কষ্টে তিন ফুট করে ওঠে, আর রাত্তির বেলা দু ফুট পিছনে নেমে যায়। রোজই যদি এইভাবে সে তিন ফুট করে ওঠে আর দু ফুট করে নেমে যায়, তাহলে কত দিনে কুয়োর থেকে বেরোতে পারবে শামুকটা বলতে পারো?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ "এই কাব্যটায় তিনটে ভুল রয়েছে।" এ-ভাবে লেখা একটি বাক্য যদি দেওয়া হয়, ভুল তিনটে কী কী বার করতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

কেপ্পতপুন

গতবারের উত্তর ॥ (১)লোকটি বলল, 'আমাকে গুলি করে মারা হবে।' এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে, রাজার কথা অনুসারে, তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হয়। সেটা হয়ে যায় অসঙ্গতিপূর্ণ। আবার লোকটির বাক্য যদি মিথ্যে বলে ধরা হয়, তাহলে, রাজার কথা অনুযায়ী, তাকে গুলি করেই মারতে হয়। সেটাও তখন হয় অসঙ্গতিপূর্ণ। সেইজন্যই ছাড়া পাবে লোকটি, কেননা রাজা পড়ছেন উভয়সঙ্কটে। (২) ৩৯ দিনে। (৩) বরকন্দাজ।

সত্যসন্ধ

ছোড়দি বোধহয় নতুন তুলেছে গানটা। কাল সন্ধেবেলায় হারমোনিয়াম নিয়ে গাইছিল, আজ বিকেলেও চা দিতে এসে ছোট্কার ঘরে ঢুকে সেই সুরটাই গুনগুন করে ভাঁজছিল গলায়। ছোট্কাও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। কেননা, হঠাৎই ছোড়দিকে প্রশ্ন করল, "কী যেন গানটা গাইছিস কাল থেকে তুই?" আমি তখন ছোট্কার ঘরেই বসে।

ছোড়দি প্রথমটায় একটু লজ্জা পেল যেন। তারপর বলল, "যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়। ওঠেনি এখনও ভাল করে।"

ছোট্কা মজার মুখ করে বলল, গানটা ওঠেনি। শামুকটাও উঠতে চাইছে না।"

এ-গানের মধ্যে আবার শামুকের কথা উঠল কেন, ছোট্কার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই রহস্যটাই উদ্ধার করার চেষ্টা করি আমি আর ছোড়দি। তবে নতুন করে প্রশ্ন করতে হল না। আমাদের মুখেই ছিল বিস্ময়ের ছায়া, ছোট্কা যেন সেই ছায়া দেখেই বলল, "গানটা শুনে একটা শামুকের কথা মনে পড়ল। একটা মজার শামুক। তারও এই অবস্থা হয়েছিল। যেতে যেতেও যেতে পারছিল না বেচারি, কেবলই ফিরে ফিরে আসতে হচ্ছিল, আর তাই নিয়েই অঙ্ক। থুড়ি, অঙ্ক কেন, ধাঁধাই।" ছোট্কা নিজেই জিব কেটে বলল, "সত্যিই দারুণ ধাঁধা। চলবে নাকি সতুবাবু?"

চলবে আবার না। সেইটেই এবারের প্রথম ধাঁধা।

কিসের ফোটো

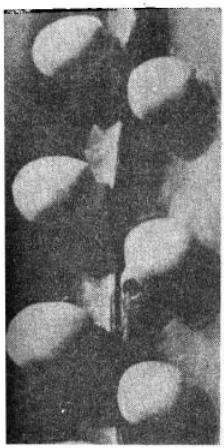

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল লরির চাকার ফোটো
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

বাংলায় 'খালি' কথাটা যেমন দু অক্ষরে লেখা যায়, এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কি পাঁচ অক্ষরের কমে হয়?
হ্যাঁ, ইংরেজিতেও দু-অক্ষরে লেখা যায়, M. T.

অধিবাসীরা ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও কোন্ দেশের কালো নাম ঘুচল না?
শ্যামদেশের।

মাকে কি কেউ মামি বলে ডাকে?
ডাকে বই কী। মেমসাহেবের ছেলেমেয়েরা।

গ্রুকো মার্কসরা চার ভাই একসঙ্গে একটা সিনেমায় অভিনয় করেছিল, সিনেমার নামটা বলতে পারেন?
পারি। FULL MARX.

চায়ের ওপর কর বসালে কেমন হয়?
চাকর বাড়ে।

সুসেন

মজার খেলা

দেশলাইকাঠি দিয়ে বহু মজার-মজার খেলা এর আগে আমরা শিখেছি, তাই না? কিন্তু এখনও বহু খেলা শেখা বাকি, কেননা, দেশলাইকাঠি দিয়ে অজস্র খেলা হয়, আর এ এমন একটা জিনিস, যা সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়, যে-কোনও সময়।

তাই এসো, নতুন একটা খেলা শিখি। পাঁচটা দেশলাইকাঠি বন্ধুর হাতে তুলে দাও। কাঠিগুলো সবই যেন বেশ আস্ত হয়। এবার বন্ধুকে বলো, এই পাঁচটা কাঠিকে যে-কোনও ভাবে সাজিয়ে চোদ্দ করতে হবে। দেখবে, শুনতে যতই সহজ হোক, না জানা থাকলে উত্তরটা করা তেমন সহজ কাজ নয়। বন্ধু যতই চেষ্টা করুক, পারবে না।

সুতরাং সে তোমাকেই তখন ধরবে, বলবে, করে দেখাও। তুমি তার হাত থেকে কাঠি পাঁচটা নিয়ে নীচের ছবির মতো সাজিয়ে দাও।

এবার তাকে গুনে-গুনে দেখাও, একদম ওপরে রয়েছে এগারো, তার নীচে-নীচে তিনটে এক। যোগ করলে চোদ্দ হয় না? এই মজার সমাধান দেখে বন্ধু কেমন মজা পায়, সেটা একবার হাতে-কলমেই করে দ্যাখো।

মজারু

হাসিখুশি

খদ্দের: একটা ইঁদুর-ধরা কল দিন তো! এক্ষুনি বর্ধমান লোক্যালটা ধরতে হবে।

দোকানদার: আমাদের তৈরি ইঁদুরকলে ইঁদুরই ধরা যায়, বর্ধমান লোক্যাল ধরা যায় না। দুঃখিত।

ডাক্তার: আপনার নাড়ি তো ঘড়ির মতো সচল দেখছি, ভয় কিসের?

রোগী: নাড়ির শব্দ নয় ডাক্তারবাবু, আপনি আসলে আমার হাত-ঘড়ির শব্দ শুনেছেন।

"কোন বই থেকে আপনি সবচেয়ে বেশি উপকার পেয়েছেন?" বার্নার্ড শ'কে প্রশ্ন করলেন এক সাংবাদিক।

"আমার ব্যাঙ্কের চেকবই থেকে।" হাসতে-হাসতে জবাব দিলেন শ'।

★

বিচারক: তুমি একই বাড়িতে পাঁচবার চুরি করেছ কেন?

চোর: কী করব হুজুর, এ-গাঁয়ে আর বেশি বাড়ি নেই যে!

★

মাস্টারমশাই: তোমাকে আমি বহুদিন বলেছি, আমাকে না বলে বাইরে যাবে না। কতক্ষণ আগে বাইরে গিয়েছিলে?

বুকুন: স্যার, বেশিক্ষণ নয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ঠিক একটু আগে।

ছবি অহিভূষণ মালিক

ইতিহাসে উপেক্ষিত

আশিস দাশ

সাদা গোঁফ-দাড়িওয়ালা বুড়ো ফকির তার কুঁজো দেহটা খুবই আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, আমি ওর পেছনে। বুনো গাছগাছালিতে ভরা, নিস্তব্ধ, নিঝুম জায়গা। হঠাৎ ফকির থমকে দাঁড়িয়ে তার শতচ্ছিন্ন আলখাল্লার মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল। আর একটু এগিয়ে বলল, "সাঁঝবাতি, আগরবাতি জ্বালাতে হবে।"

বুড়ো ফকিরের মতোই আমাদের চলার সরু পথটার গায়েও অজস্র বলিরেখা। রাস্তাটার কালচে ইটের ফাঁকে-ফাঁকে সবুজ শ্যাওলাই প্রমাণ করছে ওদের নিঃসঙ্গতা। আবছা আলো-আঁধারিতে বুড়ো ফকিরকে দেখে মনে হয় কোনো অশরীরী যেন হাওয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ওই ফকির আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠল, "ওই যে সামনে যাঁরা পাশাপাশি শুয়ে আছেন, তাঁরা আজ থেকে তিনশো একাত্তর বছর আগে শুয়েছেন।" চোখের সামনে নিশ্চল কবরগুলো নিঃশব্দে কথা বলার আয়োজনে অধীর হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ইতিহাস জীবন্ত হল।

*****

বিরাট তলোয়ার খাপ থেকে খুলেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করলেন সেই পরাক্রান্ত নায়ক। শুরু হল প্রচণ্ড তলোয়ারের যুদ্ধ। ঝনঝনানিতে চারিদিকের বাতাস খান-খান হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কুতুবুদ্দিন ক্রমশ পিছু হটছেন। পিছু হটতে-হটতেই ধরাশায়ী হয়ে নিহত হলেন তিনি।

এই কুতুবুদ্দিনকে পাঠিয়েছিলেন তখনকার দিল্লির প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট জাহাঙ্গির। বর্ধমানের জায়গিরদারকে শায়েস্তা করতে। সেই দুর্দান্ত সাহসী বীর জায়গিরদার কে ছিলেন

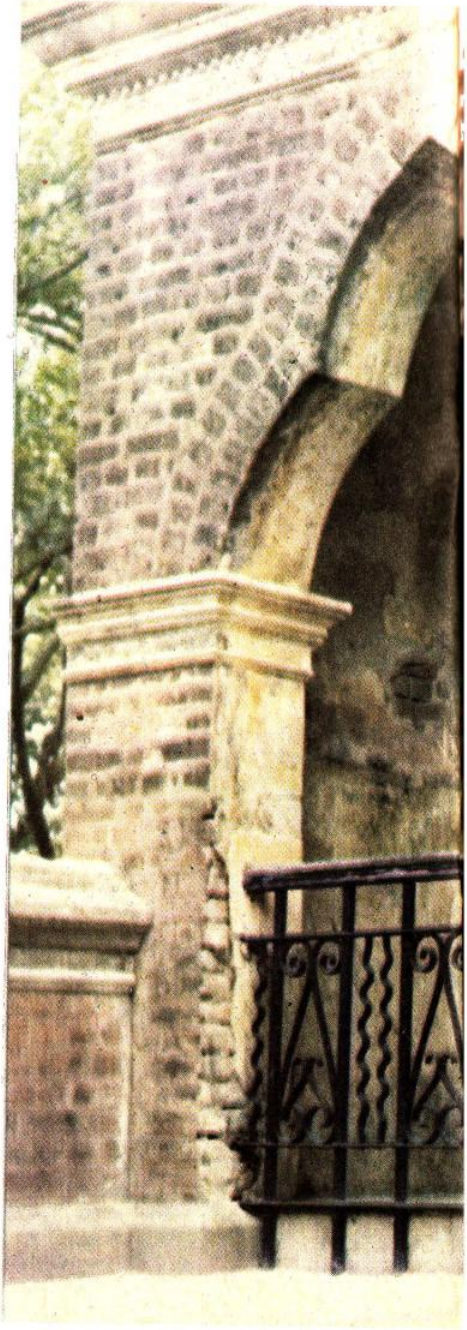

আলমগঞ্জের সেই দুই সমাধি

ছবির মজা

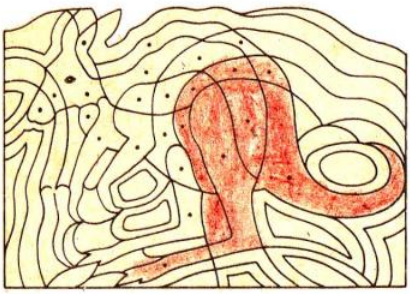

ফুটকি-দেওয়া খোপগুলি রঙ-পেনসিল বুলিয়ে ভরাট করো। তাহলেই একটা ক্যাঙারুর ছবি পেয়ে যাবে। ক্যাঙারু কোন্ দেশের প্রাণী, জানো তো? অস্ট্রেলিয়ার। দারুণ লাফাতে পারে।

ব্যাগ-পাইপ বাজাচ্ছে এই ছেলেটি। রঙ-পেনসিল বুলিয়ে একে রঙিন করো।

জানো? ইতিহাস কিন্তু ঐ বীর যোদ্ধাকে বিশেষ স্থান দেয়নি। সেই পরাক্রমশালী জায়গিরদারের নাম শের আফগান। এটা কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম আলি কুলি বেগ। তাহলে তাঁর নাম শের আফগান হল কেন?

তবে শোনো, সেই সময় এই আলিকুলি বেগ খালি হাতে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে একটা বাঘ মেরেছিলেন, আর সেই সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে শাহজাদা সেলিম তাঁর এই নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এই রকম সাহসী বীরের ছেলেবেলা কেটেছিল প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে। ইনি ছোটবেলায় ইরানের শাহ্ ইসলামের এক ভৃত্য ছিলেন। শাহের মৃত্যুর পর তিনি ইরান থেকে ভারতে চলে আসেন এবং সম্রাট আকবরের অধীনে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের জোরে উচ্চ পদ পান। সম্রাটের সহযোগিতায় ইরানের ধনী মির্জা গিয়াস বেগের অসামান্য সুন্দরী কন্যা মেহেরুন্নিসার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

মেহেরুন্নিসার রূপের খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া। সম্রাট জাহাঙ্গির শের আফগানকে বর্ধমানের জায়গিরদার নিযুক্ত করেন, কিন্তু সেই সময় বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাঁর পালিত ভাই কুতুবুদ্দিনকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান। শের আফগানের সঙ্গে তলোয়ারের যুদ্ধে কুতুবুদ্দিন নিহত হবার পর তাঁর অনুচরেরা শের আফগানকে হত্যা করে মেহেরুন্নিসাকে দিল্লিতে নিয়ে যায়, পরে ঐ মেহেরুন্নিসাই দিল্লির সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নামে বিখ্যাত হন।

*****

অন্ধকার কখন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে তা বুঝতেই পারিনি, ধীরে ধীরে একটা আলো এগিয়ে আসছে দেখে চমকে উঠলাম। সেই ফকির জানিয়ে গেল আমার যাবার সময় হয়েছে। অন্ধকারে শ্বেত-পাথরের কবর দুটো থেকে চারপাশের বাতাস যেন চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো গুমরে গুমরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বর্ধমান শহরের একপ্রান্তে আলমগঞ্জ, সেইখানে এখনো শায়িত আছেন ইতিহাসের দুই চরিত্র, শের আফগান ও কুতুবুদ্দিন।

নুন্ ওয়াক

সেদিন ছিল বড্ড বেশি গরম,
রাস্তাঘাটের পিচ হয়েছে নরম।
দুপুরবেলায় ঝরছে যখন আগুন
গদাইখুড়োর মনে তখন ফাগুন।
দরজা-জানলা বন্ধ সবার বাড়ির,
হঠাৎ একটা শব্দ হল গাড়ির।
জানলাটাকে একটু খুলে দেখি–
ওরে ব্বাবা, আজব ব্যাপার এ কী!
মাথার টাকে লাগিয়ে জালি টুপি
যষ্টি হাতে ঘুরছে চুপি-চুপি
টুকটুকে এক বুড়ো।
আরে, এ যে পাড়ার গদাইখুড়ো!
দৌড়ে গেলাম গদাইখুড়োর কাছে—
"যাচ্ছ কোথায়, বেরিয়েছিলে কাজে?"
বললে খুড়ো, "এখন কী আর কাজ,
বেরিয়েছি তাই নুন্ ওয়াকে আজ।"

ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স ১৫)

কনক-দুর্গা

প্রতি বছর পুজোর সময় আমরা আমাদের ঝাড়গ্রামের বাড়িতে যাই। সেখানে আমার দাদু, ঠাকুমা, পিসি ও কাকারা থাকেন। গত বছর পুজোর সময় আমরা চিল্‌কি গড়ে কনক-দুর্গা দেখতে গিয়েছিলাম। কনক-দুর্গা চিল্‌কি গড়ের মহারাজার ঠাকুর।

ঠাকুর দেখতে গেলে নদী পার হতে হয়। আমি ছোট পিসিমার কোলে চেপে নদী পার হয়েছিলাম। দু-দিকে ঘন জঙ্গল। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। জঙ্গলের সামনেই বিরাট মন্দির। আমরা ঠাকুর দেখলাম। আমার ঠাকুমা পুজো দিলেন। তারপর আমরা ফিরে এলাম।

তমালি বসু (বয়স ৭)

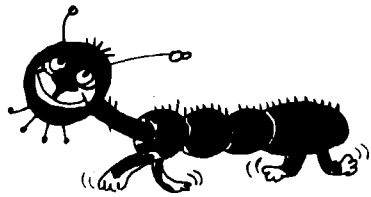

পোকা

এক যে ছিল পোকা,
পোকাটা খুব বোকা
পোকাটার রঙ কালো
পোকাটা নয় ভাল।
কামড়ে দিল কুটুস
পোকাটার নাম 'পুটুস'।

গীতিকা দাশ (বয়স ৭)

হোস্টেলে মা

আমি হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করি। বাড়ির জন্যে মাঝে-মাঝে এত মন কেমন করে! আবার বাড়ি গেলেও হোস্টেলের কথা। বন্ধুরা, মাস্টারমশাই, নারকেল গাছ, আমলকী বন, আমার পোষা টিকটিকি—সবার কথা মনে পড়ে।

আমার মা প্রত্যেক রবিবার হোস্টেলে আসে। একদিনও ভাল শাড়ি পরে আসে না। কপালে লাল টকটকে টিপটা পর্যন্ত থাকে না। মা বলে, এত দূরের পথ তো—সব নষ্ট হয়ে যাবে।

মায়ের একটা খুব চওড়া লাল-পাড় সাদা শাড়ি আছে। আমি রোজ-রোজ বায়না করি, শাড়িটা যেন মা পরে আসে!

একদিন মা ঐ শাড়িটাই পরে এল। মাকে ঠিক দুর্গা ঠাকুরের মতো দেখাচ্ছিল।

কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় কী দারুণ বৃষ্টি! জলে-কাদায় শাড়িটা একেবারে নোংরা হয়ে গেল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মায়ের দিকে তাকাতেই সাহস পাচ্ছিলাম না।

মা যেই বাসে উঠল আমি তাকিয়ে দেখি, মা খুব হাসি-হাসি মুখে আর ভিজে চোখে হাত নাড়ছে।

শতদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৩)

সন্ন্যাসিনী মা

সন্ন্যাসিনী বেশে
এলে মোদের দেশে
শিশু অনাথ যত
কোল দিয়েছ তত
বিশ্ব তোমার ধাম
মা টেরেসা প্রণাম

পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৬)

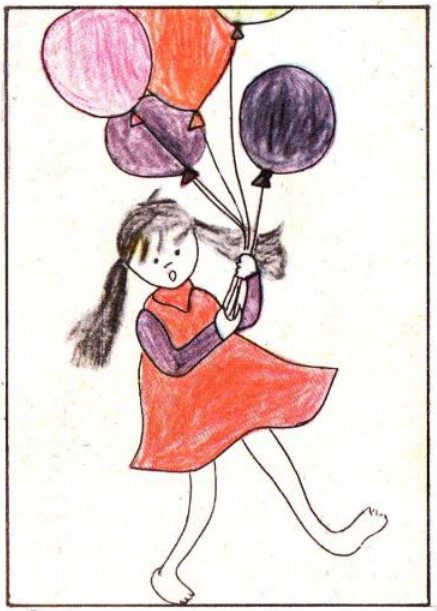

ছবি এঁকেছে : কঙ্কণ দাস (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে : তীর্থ ভৌমিক (বয়স ১৩)

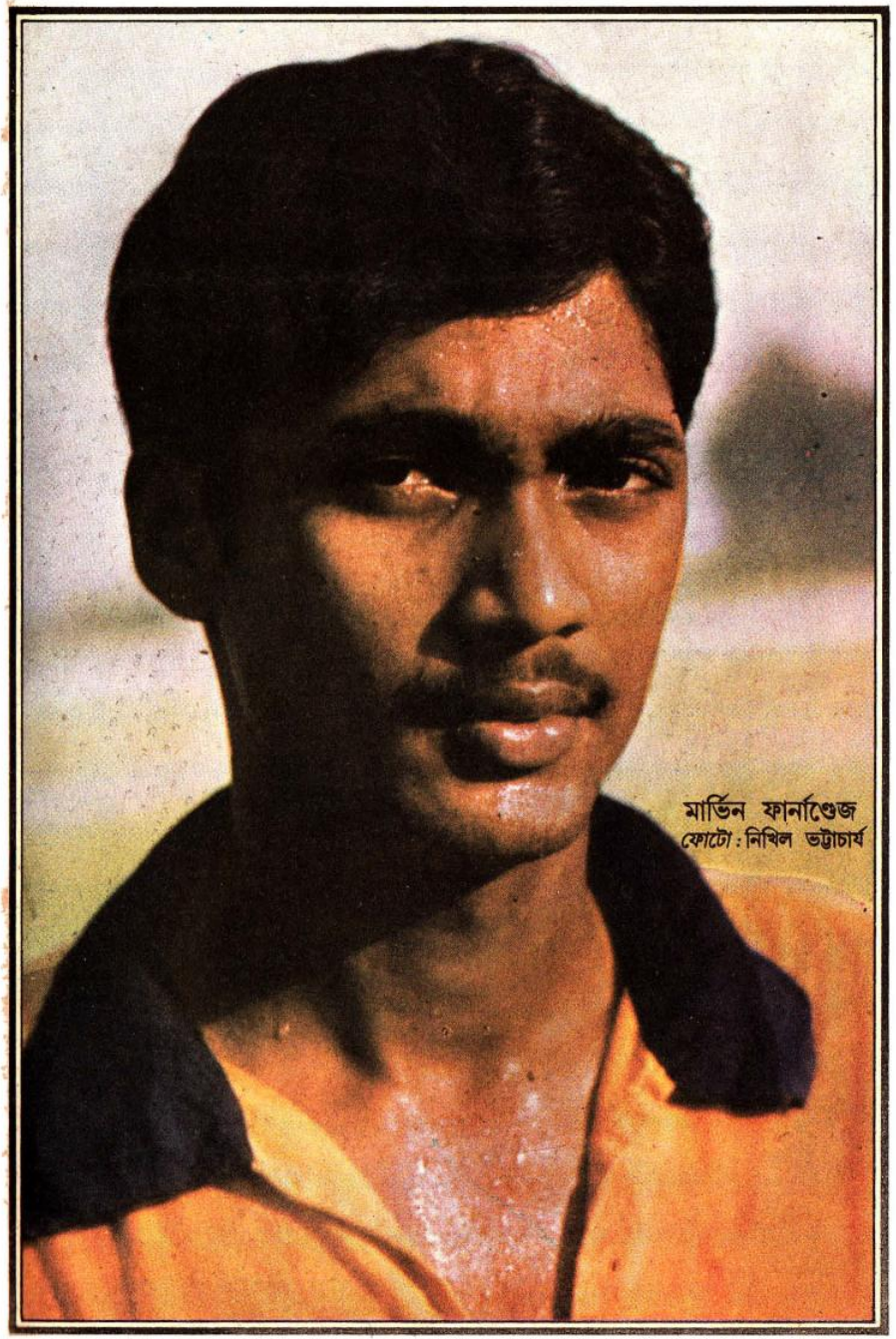

মার্ভিন ফার্নাণ্ডেজ
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

হকির দিকে চোখ নেই

অলোক দাশগুপ্ত

কথায়-কথায় সেদিন এক বন্ধু বলল, "তুই তো জানিস কয়েক বছর আগেও আমার দাদা বড় ক্লাবের হয়ে নিয়মিত হকি খেলতেন। ওঁদের সময়েও এই শহরে হকির কিছুটা জৌলুস ছিল, কিন্তু এখন আর তেমন নেই।"

এ-কথা সত্যি, ফুটবল-পাগল বাংলাকে হকি কখনই তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। বাংলার হকি বলতে আজও কলকাতা শহরের হকিকেই বোঝায়। গ্রামে হকির প্রসারে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের কোনওদিনই তেমন চেষ্টা ছিল না, আজও নেই।

কলকাতার হকি আবার মূলত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং স্থানীয় পাঞ্জাবি ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গত ১০-১৫ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি ছোট ছোট ক্লাব বাঙালি ছেলেদের মধ্যে হকির জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা করছে। জয়ন্ত দেব, সমর মুখার্জি, সুশান্ত চ্যাটার্জি, শৈবাল মুখার্জি, ডি কে ঘোষ, অমিত দাশগুপ্ত, মানব রায়চৌধুরী, রঞ্জন পাল প্রমুখ খেলোয়াড়দের সাফল্য বাঙালি কিশোরদের অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু দু-তিনটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ছাড়া রাজ্য সংস্থার আর কোনও পরিকল্পনা নেই।

তাই আজও কলকাতা হকি ময়দানে বাইরের খেলোয়াড়দের ভিড়। সিজনের গোড়াতে এঁরা বড় ক্লাবের হয়ে খেলতে আসেন, সিজন শেষ হলে অন্তত হাজার-দশেক টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু ইনাম, গোবিন্দ, বা অশোককুমারের মতো জাত-খেলোয়াড়রা কলকাতায় আসছেন না। ফলে, ভারতের তো বটেই, বিশ্বের সম্ভবত প্রাচীনতম হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপ, তার সুনাম অনেকটা নষ্ট করে ফেলেছে।

বেটন কাপ. জয়ীর পুরস্কার

বেটনের বয়স হল ৮৬ বছর। আগে ভারতের নামী দলগুলি এতে অংশ নিত, এবারের প্রতিযোগিতায় বহিরাগত দল বলতে উপস্থিত ছিল ওয়েস্টার্ন রেল, রাঁচির মেকন, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং এবং এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়া ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন একাদশ।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টার্ন রেল এবার পূর্ণ শক্তিতে হাজির হতে পারেনি। ফলে, কোয়ার্টার ফাইনালে ওরা মেকনের কাছে হেরে যায় ১-৩ গোলে। মেকন নিঃসন্দেহে এবারের প্রতিযোগিতার সেরা দল। সম্পূর্ণ আদিবাসী খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া এই দলটির স্পীড, পাওয়ার, স্ট্যামিনা এবং ফিটনেসে কোনও ঘাটতি নেই। অভাব শুধু অভিজ্ঞতার—যার জন্য সেমি-ফাইনালে ওরা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মেকন একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হবে।

প্রথম ম্যাচে মেকন ক্যালকাটা হকেটস দলকে

বেটন-ফাইনালের একটি দৃশ্য

এক গোলে হারায়। পরের খেলায় ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে এক গোলে জেতে। নর্দান রেলের কাছে ওয়াক-ওভার পাওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলকে টাই-ব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারায়। ওই খেলায় গোলরক্ষক বি বি টপনোর দারুণ খেলেছিলেন।

রাঁচির অন্য দল হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশন চমৎকার শুরু করেছিল এন্‌টালি এ সি-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে। তিনটে গোলই বিহার রাজ্য দলের খেলোয়াড় কাণ্ডো হোরোর—এটাই এবারের প্রতিযোগিতার একমাত্র হ্যাট্‌ট্রিক, কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ওরা তেমন সুবিধা করতে পারে নি, ১-২ গোলে হেরে গিয়ে বিদায় নেয়।

প্রত্যাশা অনুযায়ী আই এইচ এফ একাদশই বেটন জিতেছে ডবল-লেগ ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংকে ১-০ গোলে হারিয়ে। তবে তাদের এই জয়ে দলগত সংহতির চেয়ে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বেশি করে চোখে পড়েছে। বেটনের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন শিক্ষার্থী একাদশের মার্ভিন ফার্নাণ্ডেজ,—যাঁকে মস্কো অলিম্পিকে রাইট-ইন পজিশনে খেলতে দেখা গেছে।

আই এইচ এফ দলের ভাগ্য ভাল। 'এরা'র বিরুদ্ধে পেনাল্‌টি স্ট্রোক গোলে তাঁরা জয়ী হয়। লীগ চ্যামপিয়ন মোহনবাগানের সঙ্গে ডাবল-লেগ সেমিফাইনাল মোটামুটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছে, শিক্ষার্থী একাদশ শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকারে ৪-২ গোলে জেতে। এবারের বেটনে গোলের আকাল দেখা গেছে। তিনটি ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে টাই-ব্রেকারে, এবং চারটি ম্যাচে গোল হয়েছে পেনাল্‌টি স্ট্রোক থেকে।

ফুটবল এবং ক্রিকেটে শক্তিশালী দল গড়ার পরে মহমেডান স্পোর্টিং কর্তৃপক্ষ হকির দল গড়ায় নজর দিয়েছেন। গতবারের মোহনবাগান দলটিকে এবার সাদা-কালো জার্সি গায়ে মাঠে নামতে দেখা গেছে। লীগে মহমেডান তেমন সুবিধা করতে পারেনি, কিন্তু ২৪ বছর পরে বেটন ফাইনালে উঠল। আশা করা যায়, এই ঘটনা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করবে।

ফোটো তপন দাস

পেলের পছন্দ

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

আজ থেকে বহু বছর পরে ক্রীড়া-সমালোচকরা যখন বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবল দলটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন তখন যে একটি জায়গা নিয়ে তাঁদের কোনওরকম সংশয় থাকবে না সেটা এখনই নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়। পেলে।

সে যা-ই হোক, আজ কিন্তু পেলের কথা শোনাচ্ছি না। যে খেলোয়াড়টি সকলের মন জয় করেছেন, তাঁর মনের খবর কেউ রাখে কি? পেলের খেলা সকলেই পছন্দ করেন, এটা নতুন কথা নয়। কিন্তু পেলে কাদের খেলার প্রশংসা করেছেন? তাঁর মতে কারা সবচেয়ে ভাল ফুটবলার? এ-প্রশ্নের উত্তর জানবার কৌতূহল কার না হয়? কিন্তু অনেক বই পড়েও এর সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। অবশেষে কৌতূহলের নিরসন হল এবং দারুণভাবে। 'দা বুক অব লিস্টস' নামে একটি বই (সম্পাদনা ডেভিড ওয়ালেসিনস্কি, আরভিং ওয়ালেস ও অ্যামি ওয়ালেস) প্রকাশ করেছেন কর্গি/বুকস ১৯৭৮ সালে। বইটি ভারতেও এসেছে। এই বইটিতেই আছে পেলের পছন্দের কথা।

বুক অব লিস্টসে আছে বিভিন্ন রকম প্রয়োজনীয় তালিকা। অনেক মজার তালিকাও আছে। সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্বের দিক থেকে দশটি স্থান দেওয়া আছে। অবশ্য দশের কম বা বেশি যে নেই, তা নয়। বইটিকে গিনেস বুক অব রেকর্ডসের অপরিহার্য পরিপূরক বলা যায়। এই বইয়ের জন্যে পেলের কাছে যখন দশজন সেরা ফুটবলারের নাম চাওয়া হয়েছিল, তখন পেলে স্বভাবতই বিব্রত বোধ করেন। কাকে ছেড়ে কাকে রাখবেন পেলে? দু' দশক ধরে প্রথম শ্রেণীর ও আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলেছেন তিনি। এই সময়ের মধ্যেই ক-তো ভাল-ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে ও বিরুদ্ধে তিনি খেলেছেন। এদের মাঝখান থেকে মাত্র দশজনকে বেছে নেওয়া অসম্ভব। পেলে দেখলেন সেটা করলে বাকি অনেকের প্রতিই খুব অন্যায় করা হবে। তাছাড়া, পেলের আগে তো বহু ভাল খেলোয়াড় বিশ্বের নানা দেশে ফুটবল স্টেডিয়াম কাঁপিয়েছেন।

কী করা যায়? অনেক ভেবেচিন্তে পেলে বললেন, দশজনের পারব না, পঞ্চাশজনের একটা তালিকা দিতে পারি। আর বুক অব লিস্টসে যেমন উৎকর্ষের মান অনুযায়ী সাজানো রয়েছে তাও করছি না। অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চাশতম—এ ভাবে না বলে, শুধু পঞ্চাশজন খেলোয়াড়ের নাম তিনি দিলেন। এবং এটাও বলে দিলেন যে, ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে যাঁরা খেলেছেন, তাঁরাই মাত্র তাঁর তালিকার অন্তর্ভূত। যাঁদের খেলা দেখেননি, তাঁদের সম্পর্কে তিনি নীরব।

পেলের তালিকাটি উদ্ধৃত করি: গ্যারিনচা, জিজিনহো, ডিডি, নিলটন সানটোস, লুই পেরেরা, জালমা সানটোস, গারসন, জিটো, কুটিনহো, কারলস অ্যালবারটো, জুলিনহো, আলটাফিনি (ব্রাজিল), মেত্রেভেলি (সোভিয়েত ইউনিয়ন), নীসকেনস, ক্রুয়েফ (নেদারল্যাণ্ডস), সুয়ারেজ, জেনটো (স্পেন), ইউসেবিও, বলুনা (পর্তুগাল), জ্যাজিক, সেকুলারাক (যুগোশ্লাভিয়া), মাসোপাস্ট, ভাসনাক (চেকোশ্লোভাকিয়া), ফ্যাচেত্তি, রিভেরা (ইতালি), ববি মুর (ইংল্যাণ্ড), ইয়াসিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন), বেকেনবাউয়ার, সীলার (পঃ জার্মানি), অ্যালবার্ট, পুসকাস, বেনে (হাঙ্গারি), ক্যারিজো, ডি স্টেফানো, সিভরি (আর্জেন্টিনা), ফাইগুয়েরোয়া, রেনোসো (চিলি), ডিনা, টোমাসজিউয়িস্কি (পোল্যাণ্ড), ববি চার্লটন (ইংল্যাণ্ড), কামামোতো (জাপান), বেনিতেজ (পেরু), ফণ্টেইন, কোপা (ফ্রান্স),

ইতালির রিভেরা

বাঁ দিক থেকে : ব্রাজিলের জালমা সানটোস, জিটো ও পেলে

গুনার গ্রেন (সুইডেন), পেড্রো রোচা (উরুগুয়ে), জর্জ বেস্ট (উঃ আয়ারল্যাণ্ড), ভ্যান হিল্সট (বেলজিয়াম), রিভেলিনো (ব্রাজিল), কারবাজাল (মেক্সিকো)।

না, খাতা-পেন্সিল নিয়ে হিসেব করতে বসার দরকার নেই। কোন্ দেশের কতজন এই তালিকায় আছে সে হিসেব আমিই আগে করে রেখেছি—ব্রাজিলের ১৩ জন, আর্জেন্টিনা ও হাঙ্গারি থেকে তিনজন করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, পর্তুগাল, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, চিলি, পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স থেকে দু'জন করে এবং জাপান, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও মেক্সিকো থেকে একজন করে।

কী মনে হচ্ছে? স্বদেশ ব্রাজিলের উপর পেলের পক্ষপাতিত্ব আছে? তা হতেই পারে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, যে সময়টা পেলে বেছে নিয়েছেন তখন বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিলের প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় ছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যেই তিন-তিনবার বিশ্বকাপ জয় করে ব্রাজিল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সন্দেহ নেই, পঞ্চাশ জনকে বাছতে গিয়েও পেলের কাজটা সোজা হয়নি। তবু এতেও সন্দেহ নেই যে, গ্রাসিকস, গর্ডন ব্যাঙ্কস, ভাভা, জাইরজিনহো, নেটো, বজস্কি, কোজিস, জার্ড মুলার প্রমুখ খেলোয়াড়ের এই তালিকায় স্থান না পাওয়াটা আশ্চর্যজনক। সেখানে অবশ্য উত্তর একটাই—যাঁর পছন্দ তাঁর উপরেই ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অবশ্য পেলে একটা বিষয়ে যে পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। পঞ্চাশের মধ্যে তিরিশ জনই ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়। বাকিদের মধ্যে চারজন করে গোলকীপার ও ব্যাক এবং বারজন মাঝমাঠের খেলোয়াড়। মনে হয়, হাজার গোলের রাজার চোখে ডিফেণ্ডারদের খেলা তেমন লাগেনি!

পেলের এই পঞ্চাশজনের মধ্যে থেকে যদি একটা দল করতে বলা হয় তাহলে অনেকেই সমস্যায় পড়ে যাবেন। গোলে ইয়াসিন, মাঝমাঠে বেকেনবাউয়ার ও ববি মুরকে না হয় সহজেই বেছে নেওয়া গেল। কিন্তু ডীপ ডিফেন্সে দুই সানটোস, অ্যালবারটো ও ফ্যাচেত্তি ছাড়া আর খেলোয়াড়ই নেই। ঐ চারজনকেই নিতে হবে। তেমনি সমস্যা ফরোয়ার্ডে—তিরিশ জনের মধ্যে কোন্ চার জন? বেস্ট, ক্রুয়েফ, ডি স্টেফানো ও পুসকাস হলে মন্দ কী?

আর একটা কথা। পেলে গোটা এশিয়া থেকে একজন খেলোয়াড়কেই নিয়েছেন—জাপানি স্ট্রাইকার কুনিসিগে কামামোতো। উনি সত্যিই ভাল খেলোয়াড়। এ-তালিকায় ভারত থেকে কারও থাকার কথা নয়, নেইও।

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

ফেডারেশনে মোহনবাগান

নাগজি ট্রফি জিতে কলকাতায় ফিরেছিল মোহনবাগান। তারপর তারা ফিরল ফেডারেশন-কাপ নিয়ে। অনেকে ভেবেছিলেন, মোহনবাগান এবারে তত শক্তিশালী দল নয়। কিন্তু তাদের ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে মেরুন-সবুজ জার্সি এবারে খেলার মাঠে ঝলমল করছে। ফেডারেশন-কাপ প্রতিযোগিতার যে-ছবি আমরা ছাপলুম, তার থেকেই তোমরা বুঝে নিতে পারবে, মোহনবাগান এবার কী দাপটের সঙ্গে খেলছে।

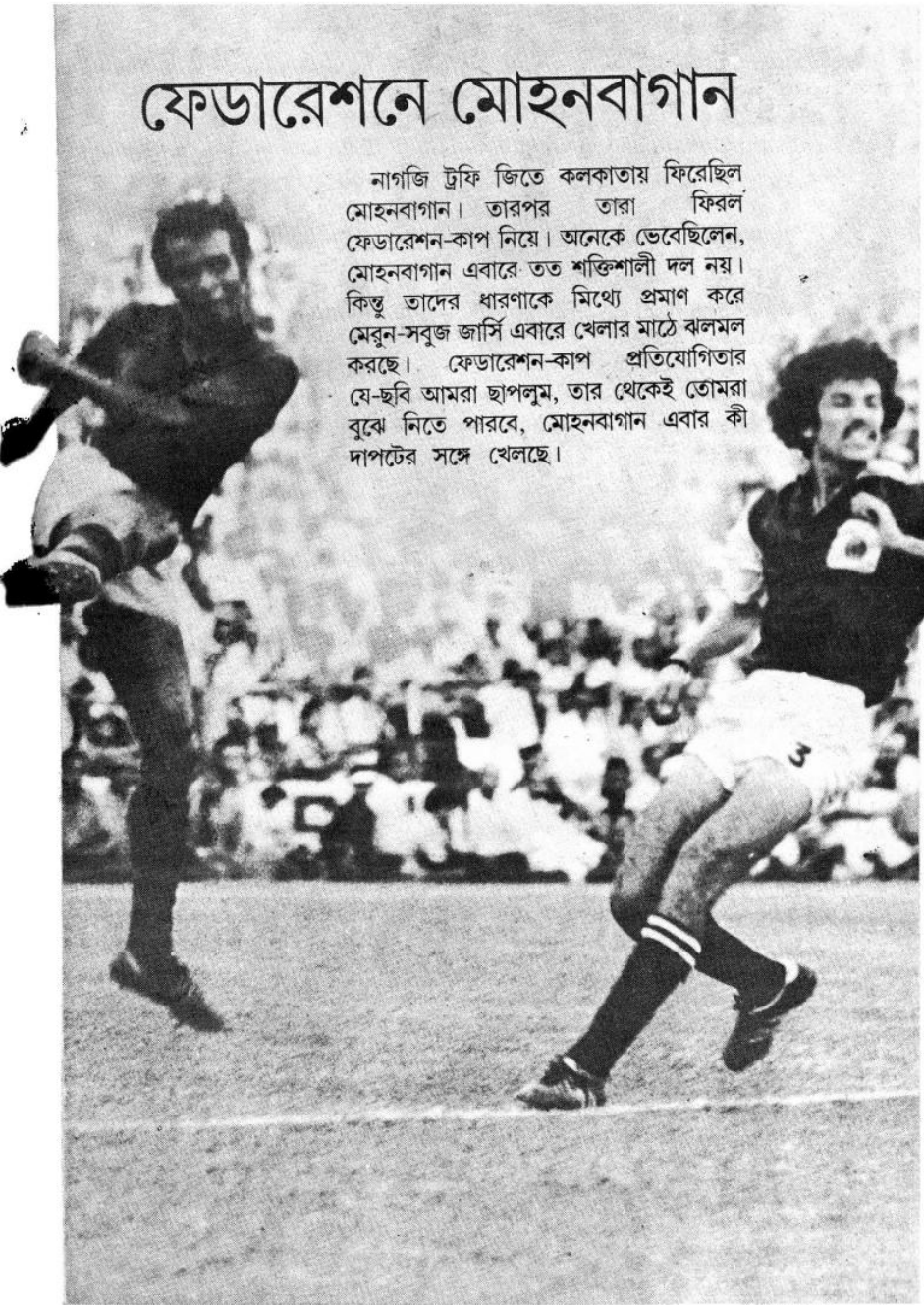

উলাগা শট নিয়েছেন, গৌরাঙ্গ বিভ্রান্ত (ফাইনাল)

ফোটো: নিখিল দাশগুপ্ত

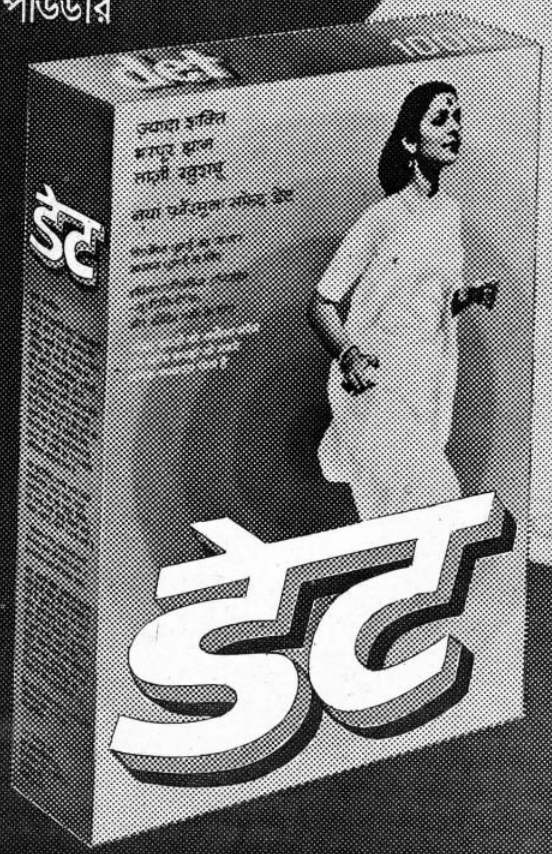

ধবধবে
সাদা
ডেট'র
সাদা
নতুন ফর্মূলা
ডেট
ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার
পাউডার
ডেট
অতুলনীয় ধোয়ার শক্তি, অফুরন্ত ফেনা,
সতেজ সুগন্ধ আর ধবধবে সাদা।
ilpi:DM-17/80 Ben.

ফেডারেশন কাপ

ফাইনালে ভাস্কর

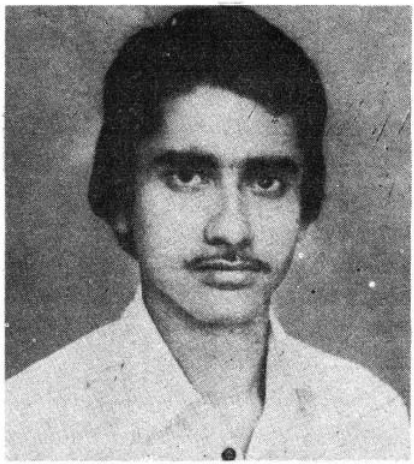

চ্যাম্পিয়ান অনিল

কুশল রায়

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্য-ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সুব্রত-কাজলের দীর্ঘদিনের আধিপত্যের ওপর ইতি টেনে দক্ষিণ পূর্ব রেলের কর্মী একুশ বছর বয়সী অনিল দে সর্বপ্রথম বাংলা-চ্যাম্পিয়ান হলেন। অনিল এখন বাঙ্গালোরে এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয়দল গঠনের ট্রায়াল ক্যাম্পে।

অনিলের এই সাফল্য আকস্মিক নয়। যেভাবে তিনি উঠে আসছিলেন, তাতে এই তরুণ প্রতিভা হয়ত গতবছরই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রাখতে পারতেন, যদি না প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বয়কটের ফলে রাজ্য প্রতিযোগিতা ভেস্তে যেত। সম্প্রতি বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রকাশ পাড়ুকোনের কাছে তিনি অসাধারণ খেলেও হেরে যান। বিশেষজ্ঞদের মতে সৈয়দ ছাড়া প্রকাশকে সব থেকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি ফেলেছিলেন এই অনিলই।

কলকাতা এবং তার চারপাশের শহরতলি থেকে নারকেলডাঙা একটা বিষয়ে যেন খানিকটা স্বতন্ত্র। চারদিকে ফুটবলের রমরমানি কেমন যেন হোঁচট খায় এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের ব্যাডমিন্টন-প্রেমের কাছে। অনিল এই নারকেলডাঙারই ছেলে। অনিলের বাবা কিন্তু প্রথমে ছেলের ব্যাডমিন্টন-চর্চা মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। সময়বিশেষে অতিরিক্ত কঠোর হতেন। মাঝে-মাঝে র‍্যাকেট হত উনুনের জ্বালানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনিলের উৎসাহে ভাটা পড়েনি।

জন্মদিনের উপহার

UCO/CAS-77/80-BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা: গরাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর নতুন গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির। গরার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখে জর্দার গন্ধ। যুধিষ্ঠিরও জর্দাপান খান। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখায়, সে-ই কি খুনের মামলায় ফেরারি আসামি গোবিন্দ মাস্টার? গোপনে তার পরিচয় জানতে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" উদ্ধব রামুকে বেত মেরেছেন। দুঃখী রামুকে গোবিন্দর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় গরা। গোবিন্দ এক গ্রামের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছে। তারপর

॥ ১৫ ॥

এমনিতে দেখতে গেলে মাস্টার গোবিন্দ বেশ সুখেই আছে। সারাটা দিন গোরু চরায়, গেরস্তবাড়ির অজস্র কাজ মুখ বুজে করে, পেট ভরে খায় আর সন্ধের পর খড়ের গাদায় ঢুকে ঘুমোয়। বোবা কালা হয়ে থাকতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেটাও সইয়ে নিচ্ছে। মাঝে-মাঝে বেমক্কা মুখ ফুটে এক-আধটা শব্দ বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু ততটা ক্ষতি কিছু হয়নি।

সেদিন গেরস্তর ছেলের বউ এক গামলা ফুটন্ত ভাতের ফ্যান উঠোনের কোণে রেখে খার কাচতে গেছে, এমন সময় গেরস্তর ছোট্ট নাতি হামা টানতে-টানতে গিয়ে সেই গামলার কানা ধরে উঠতে গিয়েছে। গোবিন্দ গোরুগুলোকে মাঠ থেকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল দুপুর বেলা। এই দৃশ্য দেখে বেখেয়ালে 'ইশ্, গেল, ছেলেটা গেল' বলে চেঁচিয়ে দৌড়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। ভাগ্যিস কেউ শোনেনি।

আর একদিন গেরস্তর মেজো ছেলে সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে এসেছিল। তখন একেবারে কাকভোর। আগের রাতে যাত্রা শুনেছে বলে ঘুমটা ভোরে খুব গাঢ় হয়েছিল গোবিন্দর। ছেলেটার ডাকাডাকিতে উঠে বসে বলে ফেলেছিল "দুত্তোর, এমন ষাঁড়ের মতো কেন চেঁচায় লোকে!" ছেলেটা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, "এ কী! তুমি যে বড় কথা বলতে পারো।" গোবিন্দ ফ্যাসাদে পড়ে অনেকক্ষণ বু-বু করল বটে, কিন্তু ছেলেটার যেন প্রত্যয় হল না। পাছে লোক-জানাজানি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তখন ছেলেটাকে কিছু-কিছু কথা খুলে বলল গোবিন্দ। রাজি করাল যাতে কাউকে না বলে।

বেশ কাটছিল। কিন্তু একদিন সকালবেলা গোবিন্দ দেখল, একটা রোগা শুঁটকো মতো লোক গেরস্তর সঙ্গে উঠোনে বসে কথা বলছে। লোকটার চাউনি-টাউনিগুলো ভাল নয়। কথা বলতে-বলতে চারদিকে নজর রাখছে। বোঝা যায় কিছু বা কাউকে খুঁজছে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর গোবিন্দ গেরস্তর মেজো ছেলেকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটা এসেছিল সে কে বলো তো!"

"ও হল ফন্তুবাবু।"

"সে আবার কে?"

"দালালি-ফালালি করে। জমি বেচাকেনার কারবার আছে।"

"আর কিছু?"

"আর কিছু তো জানি না।"

"মানুষটা কেমন?"

"তা কে জানে! তবে বাবার কাছে মাঝে-মাঝে আসে।"

"আজ কেন এসেছিল একটু খোঁজ নেবে? যাও, তোমার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো।"

ছেলেটা একটু বাদে ঘুরে এসে বলল, "কে একটা লোক জেলখানা থেকে পালিয়ে এদিকে এসেছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল।"

গোবিন্দ জেল পালানোর কথাটা ছেলেটাকে বলেনি। শুধু বলেছে, কিছু বদমাশ লোক তার পিছনে লেগেছে বলে সে লুকিয়ে আছে। গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা আমার কথা কিছু বলেনি তো?"

কিছু লোকের স্বভাব হল, বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাবে না। ছেলেটা বলল, "দাঁড়াও, গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসি।"

গোবিন্দ তাকে থামিয়ে বলল, "এখন ফের জিজ্ঞেস করলে তোমার বাবার সন্দেহ হবে। থাকগে।"

রামু মাঝে-মাঝে ছুটির দিনে গোরু চরানোর মাঠে খেলা শিখতে আসে। গোবিন্দ লক্ষ করেছে, ছেলেটা যেদিকে মন দেয় সেদিকটায় বেশ ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলতে পারে। খালি মাঠে যন্ত্রপাতি ছাড়া রামুকে আর কীই বা শেখাতে পারে গোবিন্দ? তবু যে কয়েকটা মামুলি একসারসাইজ শিখিয়েছিল, তা চটপট শিখে নিল রামু। খেলা শেখার ফাঁকে-ফাঁকে দু-একটা খবরও দিত। সামন্ত বলে দিয়েছে, পুলিশ সারকাসের ওপর নজর রাখছে তো বটেই, কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হয় পুলিশ ছাড়া অন্য-কিছু লোকও সারকাসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। আর একদিন এসে রামু জানিয়ে গেল, খুব শিগগিরই সারকাস এখান থেকে উঠে যাবে। গোবিন্দ যেন সারকাসের দলের সঙ্গে না যায়। এবার সারকাস যাচ্ছে অযোধ্যার দিকে। পারলে গোবিন্দ যেন সেখানে গিয়ে দলে ভিড়ে যায়।

সারকাসের জন্য প্রাণটা বড় কাঁদে গোবিন্দর। চারদিক থেকে আলো এসে পড়ে, শূন্যে মাটিতে তার বা দড়ির ওপর হরেক রকম খেলা চলে, সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাণ্ডের আওয়াজ—সে যেন এক স্বপ্নের জগৎ। তা ছাড়া সারকাস হল এক বৃহৎ পরিবার। সকলের জন্য সকলে। সেই সারকাসে আর ফিরে যাওয়া হবে কিনা কে জানে!

গোরু চরাতে-চরাতে এইসব ভাবে গোবিন্দ।

একদিন গোরু নিয়ে বিকেলবেলা ফিরছে, হঠাৎ দেখে গেরস্তর বাড়ির সামনে খুব লম্বা আর জোয়ান একটা লোক দাঁড়িয়ে গাঁয়ের আর-একটা লোকের সঙ্গে কী কথা বলছে। গোবিন্দ পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে শুনতে পেল গাঁয়ের লোকটা বলছে, "না, এ-গাঁয়ে খুনি গুণ্ডা বদমাশ আসবে কোত্থেকে? সে সব শহরে থাকে।"

লম্বা লোকটা বলল, "হয়তো পালিয়ে আছে।"

"পালানোর জায়গা কোথায়?"

"আচ্ছা, গবা বলে কাউকে চেনো?"

"খুব চিনি। গবা পাগলা হলেন স্বয়ং শিব।"

"তিনি কি এ-গাঁয়ে আসেন?"

"প্রায়ই আসেন। এই তো সেদিন আমার কেলে গোরুটার কলেরার মতো হল। গবা পাগলাকে ডেকে আনতে তিনি এসে এমন এক ভস্ম খাইয়ে দিলেন যে, পরদিন থেকে গোবর একেবারে ইঁটের মতো এঁটে গেল।"

এই পর্যন্ত শুনে গোবিন্দ বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু মুশকিল হল, এ-লোকটা পুলিশের লোক নয়। লম্বা এবং বিশাল চেহারার এই দানবকে গোবিন্দ চেনে। রয়্যাল সারকাসে লোকটা পাঁচ মন ভার তুলে রোজ লোককে তাক লাগিয়ে দিত। তারপর সে হঠাৎ একদিন সারকাস ছেড়ে উধাও হয়। গোবিন্দ কানাঘুষো শুনেছে, এই লোকটা অর্থাৎ সাতনা একটা বাজে সঙ্গে পড়ে খুন-খারাপি করে বেড়ায়। কেন সাতনা খারাপ লোকেদের দলে ভিড়ল তাও খানিকটা জানে গোবিন্দ। সাতনার সাত বছর বয়সের একটা মা-মরা মেয়ে ছিল। কে বা কারা সেই মেয়েটাকে চুরি করে সারকাস থেকে নিয়ে যায়, তারপর দশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। সাতনার অত টাকা ছিল না। আদরের মেয়েকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য সে রয়্যাল সারকাসের মালিকের হাতে-পায়ে ধরে টাকাটা ধার হিসেবে চায়। কিন্তু সারকাসের মালিক টাকাটা দেয়নি। কিছুদিন পর কে মেয়েটিকে নাকি কাশীতে ভিক্ষে করতে দেখছিল। তখন তার জিব কাটা, একটা চোখ কানা। সাতনা কাশীতে যায়, কিন্তু মেয়েকে পায়নি। সেই থেকে পাগলের মতো হয়ে যায়। কাশিমের চরের কাছে সুলতানপুরে মেয়েটি চুরি যায়। সাতনা নিজের সঙ্গে মেয়েটাকে নিয়ে সারকাসের দলে ঘুরে বেড়াত। মেয়েকে খেলা শেখাত। সেই মেয়ে নিখোঁজ হওয়ায় সে আবার সুলতানপুরে ফিরে আসে। তারপর কী হয়েছে তা আর গোবিন্দ স্পষ্ট জানে না।

এখন সাতনা তার খোঁজ করছে জেনে সে

খুব অবাক হল। সাতনার সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। অবশ্য বন্ধুত্বও নেই। সাতনার সঙ্গে খুব সামান্য একটু চেনাজানা মাত্র ছিল তার।

রাতে খড়ের গাদায় শুয়ে অনেক ভেবেও সে কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। তবে সাতনার সঙ্গে হরিহর পাড়ুইয়ের খুব বন্ধুত্ব ছিল একসময়ে। হরিহর ছিল সুলতানপুরের সুলতান। তার কথায় গোটা গঞ্জ উঠত-বসত। কিন্তু সেটা করত ভয়ে। ঐ রকম ভয়ংকর লোক দুটো দেখা যায় না।

গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাঝ-রাতে আচমকা ধোঁয়ার গন্ধে উঠে বসল। চোখ কচলে চারদিকে চেয়ে কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, পুরো খড়ের গাদাটার চারপাশ দিয়ে বেড়াজালের মতো আগুনের শিখা উঠে আসছে। ভাল করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই আগুনের শিখা দাপিয়ে উঠল আকাশে। চারদিকে রক্তাভ লেলিহান ভয়ংকর আগুন। গেরস্তবাড়ি থেকে বিকট চেঁচামেচি আসছিল। লোকজন দৌড়ে আসছে।

গোবিন্দ কী করবে বুঝতে পারছিল না। চারদিকে দিয়ে আগুন যেভাবে ঘিরে ধরেছে তাতে পালানোর কোনো স্বাভাবিক পথ নেই। কিন্তু আর কয়েক সেকেণ্ড থাকলেও আগুনে বেগুন-পোড়া হতে হবে।

গোবিন্দ উঠল। পায়ের নীচে নরম খড়। তার জন্য শরীরের ভারসাম্য রাখাই দায়। লাফ দেওয়ার জন্য পায়ের নীচে শক্ত মাটি দরকার।

গোবিন্দ কিছু না-ভেবেই মাথার ওপর থেকে টেনে এক পাঁজা খড় সরিয়ে ফেলল। মাঝখানের শক্ত খুঁটিটা দেখতে পেয়ে কাঠবেড়ালির মতো সেটা বেয়ে উঠে এল একদম ওপরে। খুঁটিটার মাথায় দাঁড়ানোর জায়গা নেই। কোনোক্রমে পায়ের পাতা রাখা যায় মাত্র। কিন্তু সারকাসের খেলোয়াড়ের কাছে তা যথেষ্ট।

গোবিন্দ প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু খুঁটির মাথায় দাঁড়িয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করে জীবনের সবচেয়ে বড় লাফটা মারল। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির বিভিন্ন কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে···

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-FALOV.10-172 BG

কেন্দ্র-সমাচার

১৩৮৮ সালে মণিমেলার চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। নতুন বছরে মণিমেলার কী কার্যসূচী হবে তা ঠিক করতে বিভিন্ন রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন মহাকেন্দ্রে। গত বছরের কাজের হিসেব-নিকেশও করা হল। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, প্রতিটি মণিমেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে, তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে এবং নতুন-নতুন মণিমেলা গড়ে তুলতে হবে।

মণি-সন্দেশ

নববর্ষ-উৎসবে বিভিন্ন মণিমেলা প্রভাত-ফেরি, কুচকাওয়াজ, সমবেত ব্যায়াম ও লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান করে, এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করে।

বৈশাখী মণিমেলা, নবদ্বীপ মণিমেলা ও পুরুলিয়া মণিমেলা বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে নাটকাভিনয়, গান, আবৃত্তি, লোকনৃত্য, ব্রতচারী ও 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। আতপুর বৈশাখী মণিমেলা চারদিন ধরে নানা স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করে আসে।

ফোটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের জন্যে

সেদিন রবীন্দ্রসদনে শিশুরঙ্গনের ছোট্ট বন্ধু অর্ণব যখন চেসায়ারস হোমের প্রতিবন্ধী-বোন ক্রিস্টিনের হাতে ১০০১ টাকার একটি চেক তুলে দিল, তখন সারা প্রেক্ষাগৃহ আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিবন্ধী-বর্ষ উপলক্ষে এটি ছিল শিশুরঙ্গনের একটি শুভ প্রয়াস। গত এক দশক ধরে ছোটদের জন্য এমনি কল্যাণমূলক নানান পরিকল্পনা শিশুরঙ্গন রূপায়ণ করে আসছে। প্রতি বছর অনাথ ও বঞ্চিত শিশুদের আনন্দদানের জন্য বিনাপ্রবেশদক্ষিণায় রবীন্দ্রসদনে একটি করে নাটক মঞ্চস্থ করে তারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। এ-ছাড়া ছোটদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহায়তায় নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা যে-কাজ করে চলেছে, তাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ-দিনের অনুষ্ঠানে গান শোনাল চেসায়ারস হোমের প্রতিবন্ধী-বোন প্রকৃতি সেনগুপ্ত, ক্রিস্টিন ক্লার্কসন, মঞ্জু মণ্ডল, পুষ্প দাস ও মেনকা দেবনাথ আর তবলা বাজাল নন্দদুলাল দত্ত। তাদের এ-অনুষ্ঠান যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা অবাক হয়ে ভেবেছেন, শারীরিক পঙ্গুতা, তাদের মনের খুশিকে একটুও পঙ্গু করতে পারেনি। সবশেষে শিশুরঙ্গনের ছোট্ট শিল্পীরা অভিনয় করল, বিশেষ করে ওই প্রতিবন্ধী-ভাই-বোনদেরই আনন্দ দেওয়ার জন্য "আমার নাম টায়রা" নাটকটির। কী চমৎকার সেই অভিনয়।

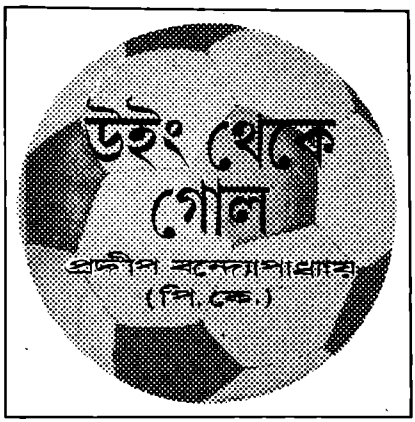

॥ ২২ ॥

মেলবোর্ন! সিডনি থেকে আমরা মেলবোর্নে পৌঁছলাম খুব ভোরে। প্রায় রাজকীয় অভ্যর্থনার পর একটা চমৎকার বাসে আমাদের তোলা হল। বাসের আগে চারজন পুলিস সার্জেন্ট চলেছেন মোটরবাইক নিয়ে। রাস্তার দুধারে ছেলেমেয়েরা ছোট-ছোট কাগজের পতাকা নেড়ে স্বাগত জানাল আমাদের। তাতে লেখা—ওয়েলকাম টু মেলবোর্ন।

বাসের একেবারে সামনে বসেছিলাম। সব কিছু দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনায় মন ভরে গেল।

অলিম্পিক ভিলেজের মুখে বিশাল গেট। আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ছোট-ছোট শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাস।

শহর থেকে দূরে এক আশ্চর্য নতুন শহর বানিয়ে ফেলা হয়েছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। একতলা ছোট-ছোট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। অলিম্পিক ভিলেজ জুড়ে পরিষ্কার রাস্তা। রাস্তার পাশেপাশে মাইল-স্টোন। মাঝেমাঝেই বড় বোর্ডে সব কিছু লেখা, যাতে কেউ পথ না হারায়। ভিলেজের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। কিন্তু ভিতরে কোনো কাঁটা নেই, শুধু ফুল আর বাগান, হাসি আর গান!

দেখলাম, নানা দেশের প্রতিযোগীরা এসে গেছেন। সবারই পরনে রঙবেরঙের ট্র্যাকস্যুট আর মুখে লেগে আছে—'ওয়েলকাম টু অলিম্পিক ভিলেজ।'

গোটা ভিলেজে উৎসবের মেজাজ। তবু তারই মধ্যে চলেছে প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রস্তুতি। অলিম্পিকে মেডেল জেতার যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামী অ্যাথলীটদেরও দেখলাম। বব মরো, ইরা মর্চিসন আর প্যারি ওব্রায়েনের মতো বিখ্যাত অ্যাথলীটদের দেখে জীবন ধন্য হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই একটা কথা মনে পড়ল—এখানে শুধু দেখতে আসিনি। কিছু করতে এসেছি। কিছু করা মানে ভাল খেলা। ভাল খেলতে হবে।

ভারতীয় দলে রাইফেল শূটার ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি ছিলেন। বিদ্বান লোক। অনেক কঠিন কথা সহজ করে বোঝাতে পারতেন। অলিম্পিক সম্পর্কেও অনেক কথা তিনি শোনালেন।

খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাও ছিল খুব ভাল। ভারত, পাকিস্তান, বার্মা এবং সিংহলের ক্যান্টিন একই জায়গায় ছিল। প্রত্যেক দেশই দু'জন করে রাঁধুনি নিয়ে গেছে। সব দেশের সেরা রন্ধনবিশারদরা বিকেলের দিকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, মাঝেমধ্যে সভাও করতেন। এ-ও আর এক ধরনের অলিম্পিক। সময়মতো নিজেদেরই খাবার নিয়ে নিতে হত। সাহায্যকারিণীরা সবাই কলেজের ছাত্রী। তাদের ব্যবহার নিখুঁত।

এক-একটা বাংলো-বাড়িতে কয়েকজন করে প্রতিযোগীর থাকার ব্যবস্থা। আমি, নিখিল নন্দী, কেষ্ট পাল, সমর ব্যানার্জি এবং নেভিল ডিসুজা—এই পাঁচজন একটা বাংলোয় উঠলাম। প্রথম ঘরে আমি, নিখিলদা, কেষ্ট পাল আর সমর ব্যানার্জি। দ্বিতীয় ঘর ফাঁকা, তৃতীয় ঘরে নেভিল ডিসুজা।

থঙ্গরাজ আর লতিফের সঙ্গে আগে থেকেই গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মেলবোর্নে গিয়ে বলরাম আর জুলফিকারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হল।

মেলবোর্নে তখন দারুণ ঠাণ্ডা। প্র্যাকটিসের সময়টুকু ছাড়া প্রায় সব সময়েই বাংলোর মধ্যে থাকতেন অধিকাংশ ভারতীয় খেলোয়াড়। আমি থাকতাম না। থাকতে পারতাম না। গোটা অলিম্পিক ভিলেজে ঘুরে-ঘুরে বিখ্যাত অ্যাথলীট আর খেলোয়াড়দের দেখতে চাইতাম। এইভাবেই একদিন বিশ্ববরেণ্য পোল-ভল্টার বব রিচার্ডসের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মাঝেমধ্যে নিখিলদা আমার সঙ্গে থাকতেন। সিনিয়াররা আমাকে বলতেন 'পাগল! নাহলে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়ায়!

ভারতের হকি দলের জন্য আমরা গর্বিত

ছিলাম। বিদেশী সাংবাদিকরাও হকি খেলোয়াড়দের খোঁজখবর নিতেন। বলবীর সিং, উধাম সিং আর জেন্টলের নাম তখন সকলের মুখে-মুখে।

তোমরা হয়তো জানো, না, বিখ্যাত ফুটবল সেন্টার ফরোয়ার্ড নেভিল ডিসুজা হকিও খুব ভাল খেলতেন। একদিন অলিম্পিক ভিলেজে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচে নেভিল বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করে ফেললেন!

মেলবোর্নে গিয়েই কোচ রহিম সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি হাসপাতালে থাকার ফলে নিজেরাই প্র্যাকটিস করতাম। ভুল বললাম, শুধু নিজেরাই নয়। জিয়াউদ্দিন সাহেব যৌগিক ব্যায়াম শেখানোর চেষ্টা করতেন। এক বিচিত্র কায়দায় তিনি নিঃশ্বাস নিতে বলতেন। আজ স্বীকার করছি, আমাদের হাসি পেয়ে যেত। খুব চেষ্টা করে মুখ গম্ভীর রাখতাম। জানতাম, আমাদের প্রথম খেলা হাঙ্গারির সঙ্গে। এই সেই দুর্ধর্ষ হাঙ্গারি দল, যা ১৯৫৩ থেকেই ফুটবল-দুনিয়াকে কাঁপাচ্ছে। কিন্তু, এই সময়েই সোভিয়েত রাশিয়া হাঙ্গারি আক্রমণ করায় হাঙ্গারি দল মেলবোর্নে এল না। ফেরেঙ্ক পুসকাসের বিরুদ্ধে খেলার সৌভাগ্য আর হল না। অবশ্য, অন্য এক সৌভাগ্যের সম্ভাবনা দেখা দিল। একটা ম্যাচ জিতলেই আমরা অলিম্পিক সেমিফাইনালে উঠব।

কোয়ার্টার ফাইনালে আমাদের খেলতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তার আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেললাম মেলবোর্ন থেকে ৪০ মাইল দূরে। রহিম সাহেব অবশ্য সামান্য আপত্তি করেছিলেন। কারণ, অস্ট্রেলিয়ানদের কড়া ধাতের ট্যাকল্ ভারতীয়দের জখম করতে পারে। প্রথমে আমার গোলে ভারত এগিয়ে গেলেও অস্ট্রেলিয়া পর-পর দুটি গোল করে জিতে গেল।

ঠিক হল, ফিরতি প্রীতি ম্যাচ অলিম্পিক ভিলেজেরই মাঠে। রহিম সাহেব তখনও অসুস্থ, কোচের ভূমিকায় ছিলেন জিয়াউদ্দিন। খেলার আগে আমাকে বললেন, "তুমি এত ভাল ড্রিবল করতে পারো, শুধু-শুধু কেন পাস করো? বল ধরে গোলের দিকে এগিয়ে নিজেই গোল করার চেষ্টা করবে। দশবার দৌড়লে দুটো গোল হবে না?"

লেভ ইয়াসিন (গোল ঠেকিয়েছেন)

জিয়াউদ্দিন সাহেবের কথা শুনে আমরা সকলেই হেসে উঠেছিলাম। তবে ম্যাচ জিতে গেলাম ৪—৩ গোলে। সমর (বদ্রু) ব্যানার্জি একটি গোল করলেন, বাকি তিনটি গোল আমার।

অলিম্পিক ভিলেজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন কিছু ফুটবলারকে প্র্যাকটিসে নামতে দেখলাম, যাদের ট্র্যাকস্যুটের বুকে লেখা—সি সি সি পি। জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল, ওটা আসলে ইউ এস এস আর। পরে লক্ষ করলাম, রোজই এগারোটা নাগাদ সোভিয়েত রাশিয়ার ফুটবলাররা প্র্যাকটিসে নামেন, মাঠে থাকেন ঘণ্টা-দুয়েক।

বছর দুই আগেই রাশিয়ার ফুটবল দল ভারত সফরে এসে সব মিলিয়ে প্রায় একশো গোল দিয়ে গিয়েছিল। ওদের খেলা দেখেই প্রথম বুঝেছিলাম, আধুনিক ফুটবল কাকে বলে।

১৯৫৬-র রুশ অলিম্পিক ফুটবল দলে বিশ্ববিখ্যাত হাফব্যাক ইগর নেটো ছাড়াও ছিলেন তাতুশ্চিন, ভয়ানভ এবং স্ত্রেলসোভের মতো দুর্দান্ত সব ফুটবলার। রাইট উইঙ্গার স্ত্রেলসোভের বয়স তখন আমারই মতো—উনিশ-কুড়ি। তিনি ছিলেন ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। দেখতে দারুণ সুন্দর, খেলা আরও অনেক····অনেক সুন্দর।

প্রায় রোজই ওদের প্র্যাকটিস দেখতাম। একদিন ওদের তেরোজন মাঠে নেমেছেন, বাকিরা অসুস্থ। দুই দলে ভাগ হয়ে খেলা হবে, কিন্তু একজন লোক কম। আমার ট্র্যাকস্যুট দেখে একজন ফুটবলার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি

প্রস্তুত হ'ল

নতুন

প্রেস্টীজ

এক অতি অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার।

যখন রান্না-করা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। সেইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন- কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টীজ। এর অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায় —সদাসর্বদা!

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন; মুহূর্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত!

সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট্-ফুট্ অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন ঢাকনা সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অকুজিলিয়ারী হ্যাণ্ডেল—যা গরম হয়ে যায় না
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝকঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারাণ্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্টীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

TTK উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

অ্যাথলীট, না অন্য কিছু খেল?" বললাম, "ফুটবল খেলি।" আমাকে একদিকে খেলতে বলা হল। কিন্তু খেলতে নেমেই মুশকিলে পড়লাম। ওদের সব পাসেই ভয়ঙ্কর স্যুইং মেশানো, যাতে বিপক্ষ দলের ডিফেণ্ডারকে এড়িয়ে বল যেতে পারে। কিন্তু সেই বল ধরা মুখের কথা নয়। ওঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, তারপর আমাকে সোজা পাসই দেওয়া হল। খেলার পর অবশ্য শিখে নিলাম, স্যুইং-মেশানো পাস কী করে 'কুশনিং' করে পায়ে জমাতে হয়। আমাদের দল ৭—৬ গোলে জিতল। জোরে-জোরে শট মেরে আমি দুটো গোল করলাম। পরে জানলাম, যাঁর বিরুদ্ধে গোল করেছি, তিনিই লেভ ইয়াসিন।

ভারত সফরে রুশ দলের একটি খেলা দেখেছিলাম। তখনই ইগর নেটোর খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবার কাছ থেকে দেখলাম, বলের ওপর এই লোকটির কী অদ্ভুত দখল! এই লেফট হাফ প্রধানত খেলতেন বাঁ পায়ে। শরীরের যে-কোনো অংশ দিয়ে বল দিব্যি জমিয়ে নিতে পারতেন। ওঁর খেলা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি ছোট ভাই প্রসূনের একটা ডাকনাম দিয়েছিলাম—'নেটো'। কী আশ্চর্য, বড় হয়ে প্রসূন সেই লেফট হাফই হল, খেলেও প্রধানত বাঁ পায়ে।

অনেক আশা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামলাম। রহিম সাহেব বললেন, "প্রদীপ, তোমাকে খুব খাটতে হবে।" কিট্টু কিছুটা পিছনে থেকে খেলা শুরু করলেন। প্রায় উইথড্রয়াল ফরোয়ার্ড। পরিকল্পনা ছিল, আক্রমণে যাবার সময়ে আমরা সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

মাঠের প্রায় সব দর্শকই অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক। দেশের মাটিতে এটাই স্বাভাবিক। খেলার শুরুতেই আমাদের গোলকীপার থঙ্গরাজের গোড়ালিতে চোট লাগল।

আমার দেওয়া ব্যাক পাস থেকে চমৎকার ভলিতে ভারতের পক্ষে প্রথম গোল করলেন নেভিল ডিসুজা। এরপর আমি আর সমর ব্যানার্জি একটুর জন্য গোল পেলাম না। বদ্রুদার ডান পা'টা সত্যিই বাঁধিয়ে রাখার মতো ছিল। কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় গোল করলেন আবার নেভিল ডিসুজা। এবার পাস বাড়িয়েছিলেন কিট্টু।

আজিজ আর থঙ্গরাজের ভুল-বোঝাবুঝিতে অস্ট্রেলিয়া একটা গোল শোধ করল। হাফটাইমে রহিম সাহেব নির্দেশ দিলেন, "প্রদীপ, তোমাকে এখন নিজের ব্যাকলাইন পর্যন্ত নেমে আসতে হবে। আবার উঠতে হবে। লড়ে যাও।"

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমর ব্যানার্জির পাস থেকে গোল করলেন নেভিল ডিসুজা। হ্যাটট্রিক! অলিম্পিক ফুটবলের ইতিহাসে ভারতের পক্ষে একমাত্র হ্যাটট্রিক। নেভিল ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান সেণ্টার ফরোয়ার্ড। ডান পায়ের ডজটি ভাল ছিল, আর ছিল ডান পায়ে গোলার মতো শট।

সমর ব্যানার্জিও চোট পেলেন। তখন খেলোয়াড় বদলের নিয়ম ছিল না। তাই অসুবিধার মধ্যেই আমাদের খেলে যেতে হল। এবং অস্ট্রেলিয়া আর একটা গোল করায় ৩—২ হয়ে গেল।

গোটা স্টেডিয়ামের দর্শকরা তখন খুব উত্তেজিত, প্রচণ্ড চিৎকার করছেন। রহিমসাহেব সাইডলাইনের বাইরে বসে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। চেঁচিয়ে বললেন, "প্রদীপ, এখন যতো পারো, বল পায়ে রাখো।" যে রহিম সাহেব পায়ে অতিরিক্ত বল রাখা একদম পছন্দ করতেন না, তিনিই এমন নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করলাম। একবার ছয়জনকে কাটিয়ে প্রায় গোলই করে ফেলেছিলাম! এইভাবেই একবার ডান দিক দিয়ে ঢুকে সেণ্টার করলাম। নেভিল হেড করে বল নামাতেই দুরন্ত ভলিতে ভারতের পক্ষে চতুর্থ ও শেষ গোলটি করলেন কিট্টু।

খেলা শেষ হল। প্রচণ্ড পরিশ্রম করার জন্যে এলিয়ে পড়লাম। সকলেই অভিনন্দন জানালেন। শুনলাম, রহিমসাহেব এম. দত্তরায়কে বলছেন, "প্রদীপ আজ দারুণ খেলেছে।" আমাকে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। তাঁর ধারণা ছিল, বেশি প্রশংসা করলে ছেলের মাথা ঘুরে যেতে পারে!

ভারত এই প্রথম সেমিফাইনালে উঠল। ভারতীয়দের মধ্যে আনন্দের জোয়ার। মাঠে ঢুকে সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন পঙ্কজ গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার আর অর্জুন সিং। শুধু রহিম সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, "পরের ম্যাচে আরও কঠিন লড়াই।"

(ক্রমশ)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

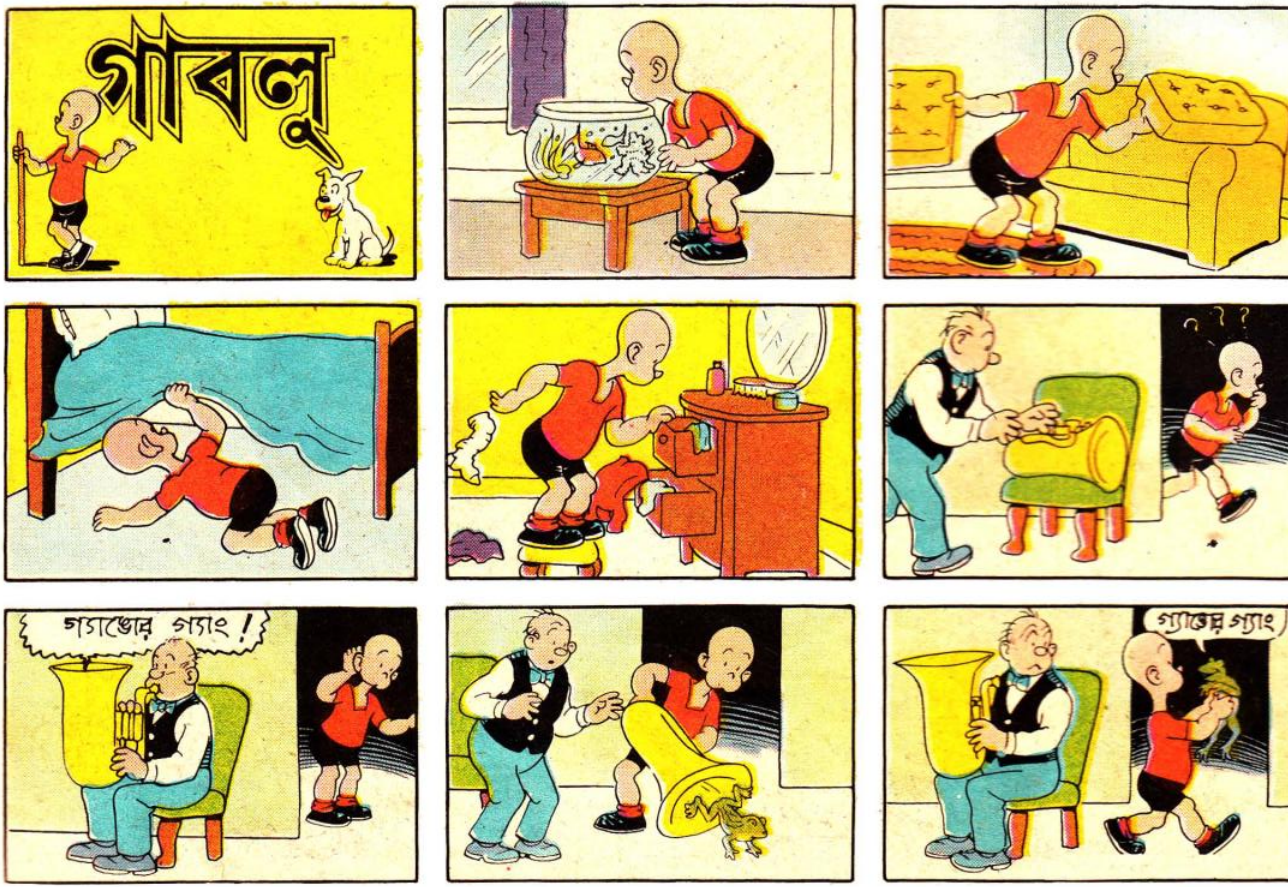

গাবলু
গ্যাঙোর গ্যাং !
গ্যাঙোর গ্যাং

'জিভ হচ্ছে গুরুদেব'

বাচস্পতি

ভণ্টু এবার আওয়াজটা চেপে রেখে আবার ঐ মিশিপাখা শিখিপাখা আউড়ে গেল। "এবার কী দেখলি?" হিগিনকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

ভণ্টুর মনে হচ্ছিল টিভি-র সিনেমা দেখতে-দেখতে হঠাৎ শব্দটা বন্ধ হয়েছে। তার ঠোঁটদুটো কখনো কানের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, কখনো তার হাঁ বড় হচ্ছে, কখনো ঠোঁটদুটো গোল হচ্ছে নানা সাইজে। আর মুখের ভেতরে জিভটার সে কী দৌড়োদৌড়ি। ঠোঁট আর জিভের এই দমবন্ধ ব্যস্ততা দেখে ভণ্টুর খুব হাসি পেল। হিগিনকাকুকে এ-কথা বলতে তিনি ডান হাতের একটা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "তবু জিভ হচ্ছে গুরুদেব!"

আচ্ছা, এর কোনো মাথামুণ্ডু হয়? এই হিগিনকাকু তাকে দিয়ে খামোখা মিশিপাখা শিখিপাখা বলিয়ে নিলেন, তার ওপর একবার আওয়াজ না-করে, আবার এখন বলছেন,

"জিভ হচ্ছে গুরুদেব!" ভণ্টু রেগে গেল এবার। বলল, "কী বলছ হিগিনকাকু? জিভকে গুরুদেব কে বানাল আবার?"

হিগিনবথাম বললেন, "বাস রে বাস, জিভের মহিমা তোকে কী বলব! জিভ মানেই ভাষা। জানিস তো, 'ভাষা' কথাটার ইংরেজি 'ল্যাঙ্গুয়েজ' কথাটা এসেছে ল্যাটিন ভাষার 'লিঙ্গুয়া' থেকে? তার মানে জিভ। তাই পোর্তুগিজ 'লিঙ্গুয়া', স্প্যানিশ 'লেঙ্গুয়া'—দুই-ই বোঝায়—জিভ আর ভাষা। ইংরেজি 'টাং' (tongue)-ও কি তাই নয়? 'মাদার টাং' মানে কি 'মার জিভ'? সংস্কৃত 'রসনা'? ফারসি 'জুবান' বা 'জবান'? জিভ নেই তো ভাষাও নেই, বুঝলি? জিভের নিন্দে করিস না, জিভ খসে যাবে!" বলে রাধার রেখে যাওয়া কালো কফিতে হিগিনকাকু সুড়ুত সুড়ুত করে চুমুক দিতে লাগলেন। আরামে তাঁর চোখ প্রায় বুজে এল।

এই সুযোগে ভণ্টু ভাবল একটা ভেংচি কেটে হিগিনকাকুকে বুঝিয়ে দেয় যে, কথা বলা ছাড়াও জিভের অন্য কাজ আছে।

হিগিনকাকু যেন মনে-মনে এই কথাটাই ভাবছিলেন। বিরাট আওয়াজ করে কফির তলানিটুকু শেষ করে বললেন, "তার মানে অবশ্য এই নয় যে, কথা বলার খবরদারি করাই জিভের একমাত্র কাজ। এমন-কী জিভের আসল কাজও নয় সেটা। জিভের আসল কাজ হল খাবারের স্বাদ নেওয়া, বুঝলি?" বলেই আরেকবার হাঁক পাড়লেন—"বৌদি, সামনের রোববার আসছি ফের, সেদিন দু-চারটে চাইনিজ রান্না করবেন"—বলে জিভের জল টেনে নিয়ে ভণ্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাইড বিজনেস কাকে বলে জানিস?"

ভণ্টু ঘাড় নাড়ল। না, সে জানে না।

"এই ধর," হিগিনকাকু বোঝাতে লাগলেন—"আমি কলেজে পড়াই, মাইনে পাই। ঐটে আমার আসল কাজ। তার বাইরে আবার আমি এখানে-ওখানে ছুটকো-ছাটকা লিখি, টাকা পাই—ঐটে আমার সাইড বিজনেস। এই কথা-বলাটা হল জিভ ঠোঁট অ্যাণ্ড কম্পানির সাইড বিজনেস।"

ভণ্টু বলল, "বুঝতে পারছি না কাকু।"

(ক্রমশ)

রেলগাড়ি চলেছে

প্রসাদ

রেলগাড়ি চলছে।
ভোরের আলো তখন ফুটেছে কি ফোটেনি, এর মধ্যেই চামেলি জানলার ধারে হাজির।

It's a beautiful morning.
It's not often that Chameli gets up so early.
In fact, it's a rare experience for her.
She looks at the sky.
It's a glorious blue.
She looks at the distant horizon.
It's misty.
A strong breeze is blowing on her face.
It's so cool.
Her hair is all over her face.
When Mummy gets up she will comb it and tie it with a ribbon.
But Chameli likes it as it is.
It's nice to have your hair blown all over your face, isn't it?

মা'র ঘুম ভাঙল।

"What time is it?" She asks.
Daddy looks at his wrist-watch.
It's still rather dark in the train.
But Daddy's wrist-watch has a radium dial.
So he can read it in the dark.
"Five o'clock," he says. "It's too early to get up."
But he gets up, anyway.
He asks for his cup of tea.
Mummy pours some tea out of the flask and gives it to Daddy.
She also pours some for herself.
"Ugh!" says Daddy. "It's stone-cold."
"It was in the flask." Mummy says.
Daddy says, "It's a shame, the way these flasks let you down. Somebody should write to the papers about it."
Daddy is always talking of writing to the papers.
But then, he himself says, "It's no use. Nobody takes any notice.

চম্বল রাত্তিরে ঘুমোবার আগে বলেছিল, "মা, আমাকে খুব ভোরে ডেকে দেবে।"

Daddy says, "Isn't it time you woke the boy up? It's nearly six."
It's never easy to wake Chambal up.

চম্বল ঘুমিয়ে থাক। আমরা একটা শব্দের দিকে একটু মনোযোগ দিই:

IT

It is a glorious blue.
Q. What is a glorious blue ?
A. The sky.
It is stone-cold.
Q. What is stone-cold?
A. The tea.

কিন্তু নীচের বাক্যগুলিতে ওই শব্দটি অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে:

It's a beautiful morning.
It's dark inside the compartment.
It's too early to get up.
It's not easy to wake Chambal up.

বাঘা

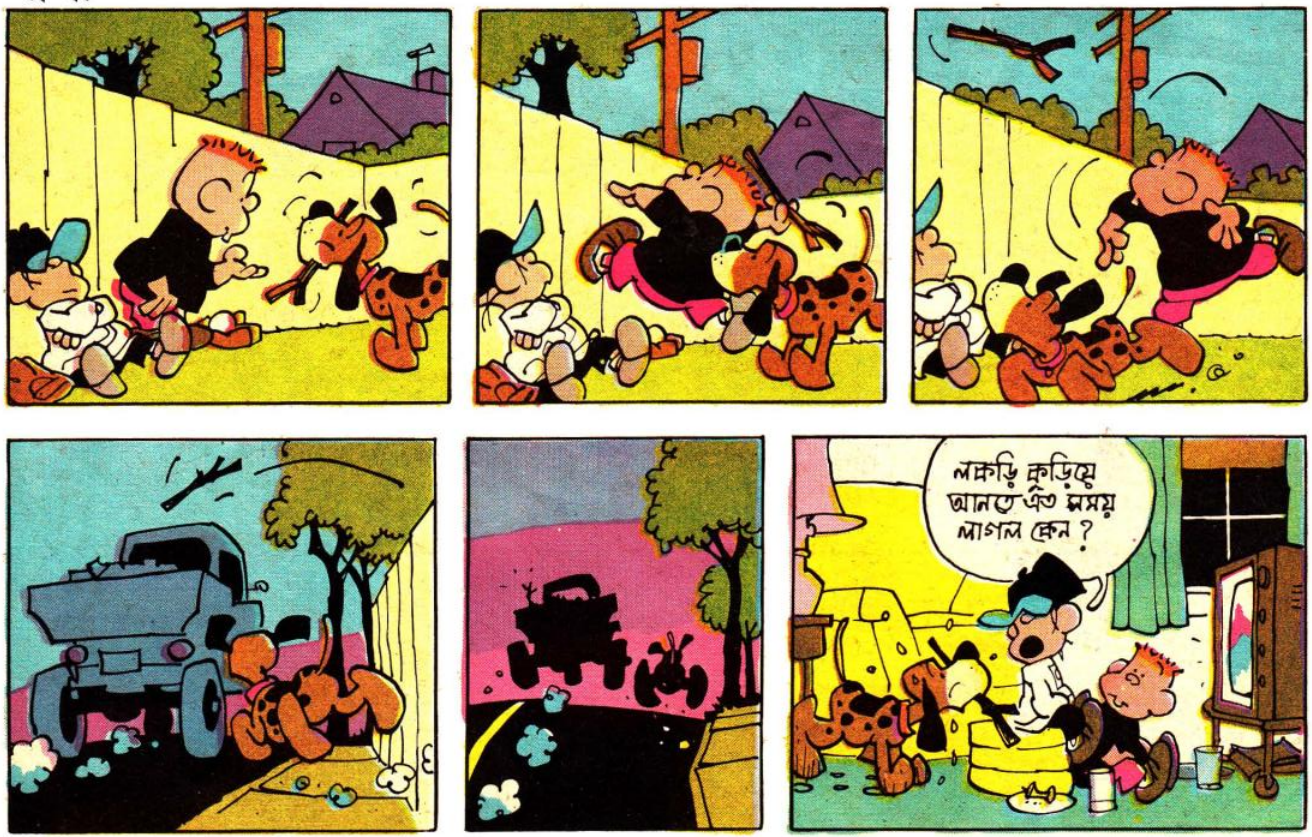

গাবলু
যাচ্চলে, কেক
কোথায়?

ছোটদের যত সেরা বই

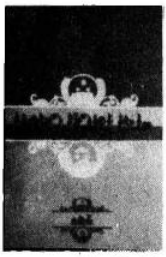

কুন্তক-এর 'শব্দ নিয়ে খেলা' এমন একটি বই যা শুধু একবার পড়েই ফুরিয়ে ফেলা যায় না। বারবার পড়তে হয়. মাঝেমাঝেই করতে হয় নাড়াচাড়া। হাতের নাগালে না পেলে মনে হয়. দামী জিনিস হয়ে গেছে হাতছাড়া। কেন বলো তো? যারা পড়েছ. তারা তো জানোই. যারা জানো না. তাদের জন্য বলছি, এই বইতে কুন্তক একেবারে গল্পের মতো করে শিখিয়েছেন বাংলা বানানের অনেক মজাদার ব্যাপার স্যাপার যা জানলে একদম ভুল হবে না বানান। শুধু ছোটরা নয়. বড়োরাও আগ্রহ বোধ করবেন এ-বই পড়তে। সহজে বানান শেখার এমন বই বাংলা ভাষায় আগে বেরোয়নি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নতুন লেখক. কিন্তু শুরুতেই তিনি শাদা ঘোড়ার দিগ্বিজয়ী সওয়ার হয়ে শিশুমনের একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছেন। দুটি কাহিনীর একত্র-সংকলন 'শাদা ঘোড়া' এক দাম্ভিক রাজার জেদ আর অবিচারের উঁচু মাথা কী করে নুয়ে পড়ল এক সামান্য রাখালের স্বপ্ন ও সংকল্পের কাছে তাই নিয়ে 'শাদা ঘোড়া'। আরেকটি কাহিনী 'ঋষিকুমার'ও একইরকম সুন্দর। ছোটদের স্বপ্নের কথা. কল্পনার কথা. আনন্দ আর দুঃখের কথা এই বইতে যেভাবে বলা হয়েছে সহজে তার তুলনা মেলে না। পাতায় পাতায় পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি বাড়তি আকর্ষণ।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৮ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৭ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৭ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৭ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৭ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৭ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৬ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৮ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭ তপন চরিত ৬ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণমালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৬ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬ আমার নাম টায়রা ৬ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ১০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৫ শরদিন্দু অম্নিবাস ৪র্থ ২৫ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫ কলকাতার রাজকাহিনী ৫ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **পাপু (সুব্রত সরকার)-র** পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ১০ **সংকর্ষণ রায়ের** গভীর গহন ৭

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

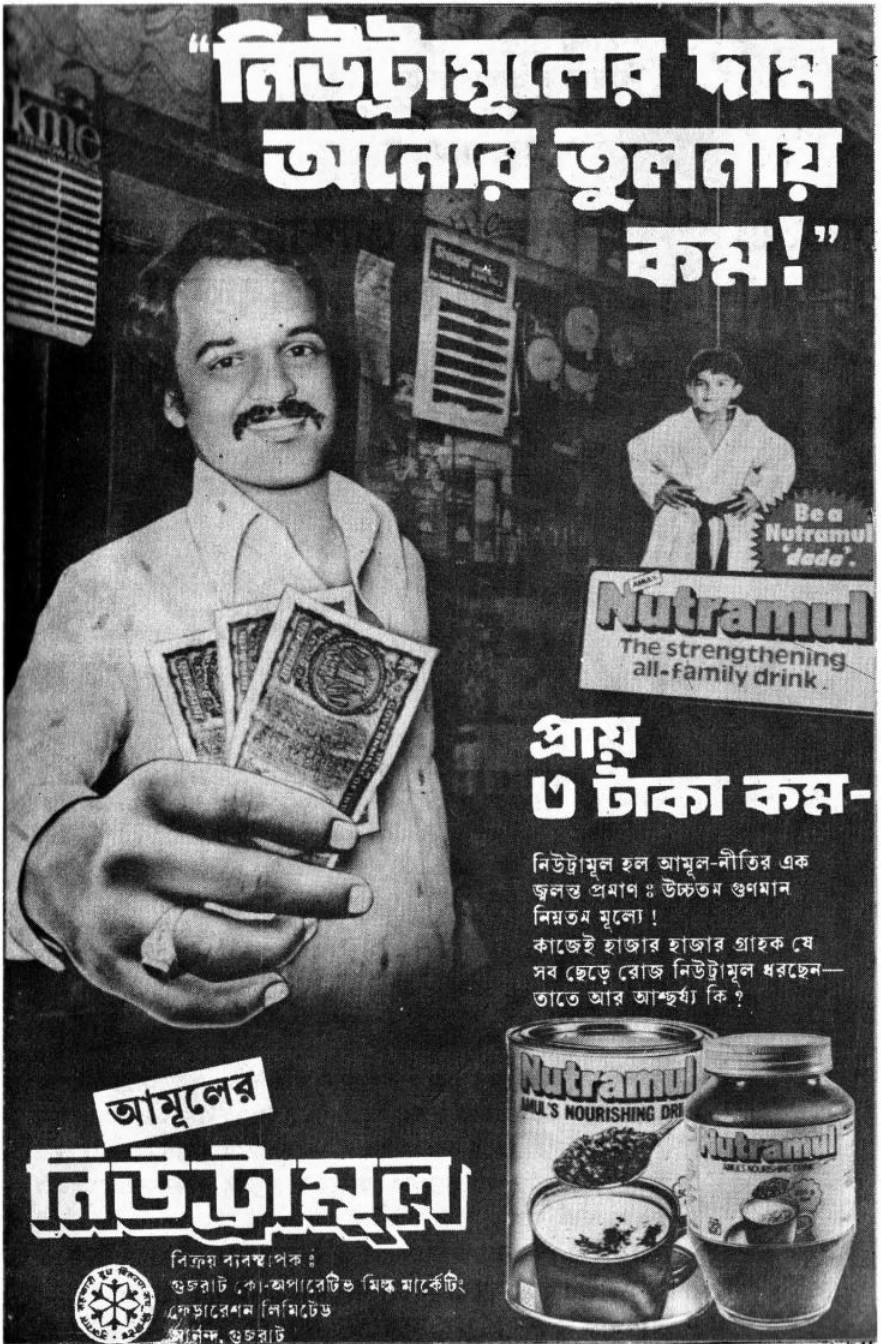

daCunha-GCM 31 BN

"বালী বালী, শক্ত দানার টুথ পাউডার আপনার দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করতে পারে..."

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন - সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN